ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজাগাপত্তন,

এবং তৎসহিত

কটক, নারাজ, সিদ্ধেশ্বর, ধবলেশ্বর, ভুবনেশ্বর,

খণ্ডগিরি, উদয়গিরি,

ও

সাক্ষীগোপালের

বর্ণনা।

শ্রী—দাস প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

উইলিয়ম্‌স্‌ লেন, ৪ নং ভবনস্থ

দাস যন্ত্রে

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচিপত্র।

প্রথম কথা (১) ১
আয়োজন ও যাত্রা (২) ৫
পথ (৩) ৯
উপস্থিতি (৪) ১২
অবস্থিতি (৫) ১৬
খাদ্য (৬) ২১
স্থানের গুণ (৭) ২৯
স্বাস্থ্য (৮) ৩৩
স্নান (৯) ৪১
স্থানের আরও কথা (১০) ৪৯
দৃশ্য (১১) ৫৬
সীতারাম বাবাজীর পাহাড় ও খ্রীষ্টান শৈল (১২) ... ৬২
মুশলমান ও হিন্দু পাহাড় (১৩) ৬৭
ডল্‌ফিন্স নোজ ও ভ্যালি গার্ডেন (১৪) ৭২
সীমাচল যাত্রা—পথের দৃশ্য (১৫) ৮০
সীমাচলে আরোহণ (১৬) ৮৬
সীমাচল ও মাধোধারা দর্শন (১৭) ৯২
অধিবাসী (১৮) ৯৯
রমণী (১৯) ১০৭
পর্ব্ব (২০) ১১৩
কথা ও ভাষা (২১) ১২২
কটক (২২) ১২৯
নারাজ, সিদ্ধেশ্বর, ও ধবলেশ্বর (২৩) ১৩৩
ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, ও উদয়গিরি (২৪) ১৩৮
সাক্ষীগোপাল (২৫) ১৪৫
পরিশিষ্ট ১৪৯

চিত্র-তালিকা ।

১। ভিজাগাপত্তনের সমুদ্রতীরস্থ রাস্তার সর্ব্ব-দক্ষিণ অংশ ... ৩৬
২। সমুদ্রে নৌকা ভাসান হইতেছে ৪১
৩। বৃহৎ জালের দুই ধারের দড়ী দুই দল জেলে টানিতেছে ৫০
৪। বাটী ৫১
৫। দুর্গা-মন্দির ৫৮
৬। খ্রীষ্টান পাহাড়ে উঠিবার পথ ও উপরে গির্জ্জা ... ৬৫
৭। মস্‌জিদ ও গির্জ্জার পাহাড়ের মধ্যস্থ পথ ... ৬৭
৮। হিন্দু পাহাড়ের উপরিস্থ মহাবিষ্ণু-মন্দির ... ৬৯
৯। সীমাচলের সিঁড়ীর অত্যন্ত চড়াই অংশ ও প্রথম ফটক ৮৮
১০। সীমাচলে নৃসিংহ-মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বের তলদেশের এক অংশ ৯২
১১। মাধোধারার তৃতীয় বা সর্ব্বনিম্ন ধারা, অনেকে ইহাকেই মাধোধারা বলে ৯৬

ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তন,

এবং তৎসহিত

কটক, নারাজ, সিদ্ধেশ্বর, ধবলেশ্বর, ভুবনেশ্বর,

খণ্ডগিরি, উদয়গিরি,

ও

সাক্ষীগোপালের

বর্ণনা।

শ্রী—দাস প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং ভবনস্থ

দাস যন্ত্রে

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি ১৩১৪-১৫ সালে "সময়" নামক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে যে পুনঃ প্রকাশিত হইবে, ইহা তখন আমি ইচ্ছা বা আশা করি নাই। কিন্তু সময়ে পাঠ করিয়া অনেকে আমোদিত হইয়া বলেন, সংবাদপত্রের অস্থায়ী বা ক্ষণিক স্থায়ী সাহিত্যের স্তর হইতে এই লেখাগুলির উদ্ধার করিয়া পুস্তকরূপে স্থায়ী সাহিত্যের স্তরে স্থান দেওয়া উচিত, কারণ উহাতে জানিবার উপযুক্ত ও সাধারণের—বিশেষ যাঁহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রয়াসী তাঁহাদের—প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় আছে। এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। সময়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অনেক স্থানের ইহাতে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। জানি না এই পুস্তক সাধারণ দ্বারা আদৃত হইবে কিনা, সম্ভবতঃ এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ও উঠিবে না। তথাপি এই পুস্তক দ্বারা দুই এক জনেরও উপকার হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। যাঁহারা স্বাস্থ্যের জন্য ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তন যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনও অসুবিধা ভোগ করিবেন না। খুটিনাটি সামান্য বিষয় হইতে উচ্চ বিষয় পর্য্যন্ত সকলেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে বর্ণনা আছে। আমি নিজে দেখিয়া ভুগিয়া যাহা শিখিয়াছি, তাহাই ইহাতে প্রকাশ করিয়াছি।

কয়েকটী হাফটোন চিত্র এই পুস্তকে দিলাম। উহা ভাল হয় নাই তাহা আমি জানি, কারণ উহাদের ফটোগ্রাফগুলি আমার নিজের হস্তের

প্রথম তোলা। আমি পূর্ব্বে কখন ফটোগ্রাফ করি নাই, করিতে শিখিও নাই। তিব্বাগাপত্তনে যাইবার সময় আমোদ লাভ বা সময় কাটাইবার উদ্দেশ্যে একটী সাধারণ ফটোগ্রাফ যন্ত্র কিনিয়া সঙ্গে লই, এবং অশিক্ষা বা প্রথম শিক্ষার অবস্থায় উহার সাহায্যে ফটোগ্রাফ তুলি, সুতরাং ঐরূপ ফটোগ্রাফ কিরূপে ভাল হইতে পারে? তবে উহাদের চিত্র হইতে আসল বস্তুগুলির কিছু কিছু আভাস পাঠক পাইবেন, কেবল এই আশায় ঐগুলি প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩১৭।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রী—দাস।

সূচিপত্র ।

প্রথম কথা (১) ১
আয়োজন ও যাত্রা (২) ৫
পথ (৩) ৯
উপস্থিতি (৪) ১২
অবস্থিতি (৫) ১৬
খাদ্য (৬) ২১
স্থানের গুণ (৭) ২৯
স্বাস্থ্য (৮) ৩৩
স্থান (৯) ৪১
স্থানের আরও কথা (১০) ৪৯
দৃশ্য (১১) ৫৬
সীতারাম বাবাজীর পাহাড় ও খ্রীষ্টান শৈল (১২) ... ৬২
মুশলমান ও হিন্দু পাহাড় (১৩) ৬৭
ডলফিন্স নোজ ও ভ্যালি গার্ডেন (১৪) ৭২
সীমাচল যাত্রা—পথের দৃশ্য (১৫) ৮০
সীমাচলে আরোহণ (১৬) ৮৬
সীমাচল ও মাধোধারা দর্শন (১৭) ৯২
অধিবাসী (১৮) ৯৯
রমণী (১৯) ১০৭
পর্ব্ব (২০) ১১৩
কথা ও ভাষা (২১) ১২২
কটক (২২) ১২৯
নারাজ, সিদ্ধেশ্বর, ও ধবলেশ্বর (২৩) ১৩৩
ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, ও উদয়গিরি (২৪) ১৩৮
সাক্ষীগোপাল (২৫) ১৪৫
পরিশিষ্ট ১৪৯

চিত্র-তালিকা।

১। ভিজাগাপত্তনের সমুদ্রতীরস্থ রাস্তার সর্ব্ব-দক্ষিণ অংশ ... ৩৬
২। সমুদ্রে নৌকা ভাসান হইতেছে ৪১
৩। বৃহৎ জালের দুই ধারের দড়ী দুই দল জেলে টানিতেছে ৫০
৪। বাটী ৫১
৫। দুর্গা-মন্দির ৫৮
৬। খ্রীষ্টান পাহাড়ে উঠিবার পথ ও উপরে গির্জ্জা ... ৬৫
৭। মস্‌জিদ ও গির্জ্জার পাহাড়ের মধ্যস্থ পথ ... ৬৭
৮। হিন্দু পাহাড়ের উপরিস্থ মহাবিষ্ণু-মন্দির ... ৬৯
৯। সীমাচলের সিঁড়ীর অত্যন্ত চড়াই অংশ ও প্রথম ফটক ৮৮
১০। সীমাচলে নৃসিংহ-মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বের তলদেশের এক অংশ ৯২
১১। মাধোধারার তৃতীয় বা সর্ব্বনিম্ন ধারা, অনেকে ইহাকেই
মাধোধারা বলে ৯৬

শ্রীমতী———দাসী, জীবন-সঙ্গিনী।

স্বামীর সুখসচ্ছন্দতা সাধনের জন্য স্ত্রী প্রাণপণ চেষ্টা করে, তুমিও তাহাই আমাদের মিলনাবধি করিয়া আসিতেছ, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, প্রায় হিন্দু স্ত্রী মাত্রই স্বামীর জন্য তাহা করিয়া থাকে। কিন্তু আমার সুখ ও স্বাস্থ্যের জন্য আমি স্বয়ং যত না ভাবি, যত না কাতর হই, তুমি তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ভাব, অনেক অধিক কাতর হও। আমি রোগে জীর্ণ ও অক্ষম, শত্রু ও জ্ঞাতিদের বিষাক্ত দংশনে জরজর, তথাপি কর্ম্মস্থল হইতে সরিব না। কিন্তু তুমি দেখিলে, এইরূপে চলিলে আমার আর অধিক দিন পৃথিবীতে থাকা হইবে না, তখন তুমি চক্ষের জলের সহিত আমাকে সাধিয়া বুঝাইয়া স্থান ত্যাগ করাইয়া আমাকে ভিজাগাপত্তনে আনিলে। এবং তাহাতেই কিছু দিনের জন্য রোগ হইতে মুক্তি ও চিন্তার যন্ত্রণা হইতে শান্তি লাভ করি ও সেই বিরাম-কালে এই পুস্তক রচনা করি। তুমি আমাকে ভিজাগাপত্তনে আসিবার প্রবৃত্তি না দিলে এই পুস্তকের একটী অক্ষরও সাদা কাগজের উপর উঠিত না। সুতরাং আমার জন্য তোমার যত্ন ও চেষ্টা স্মরণার্থ তোমার নামে এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

১লা বৈশাখ, ১৩১৭। শ্রী—দাস।
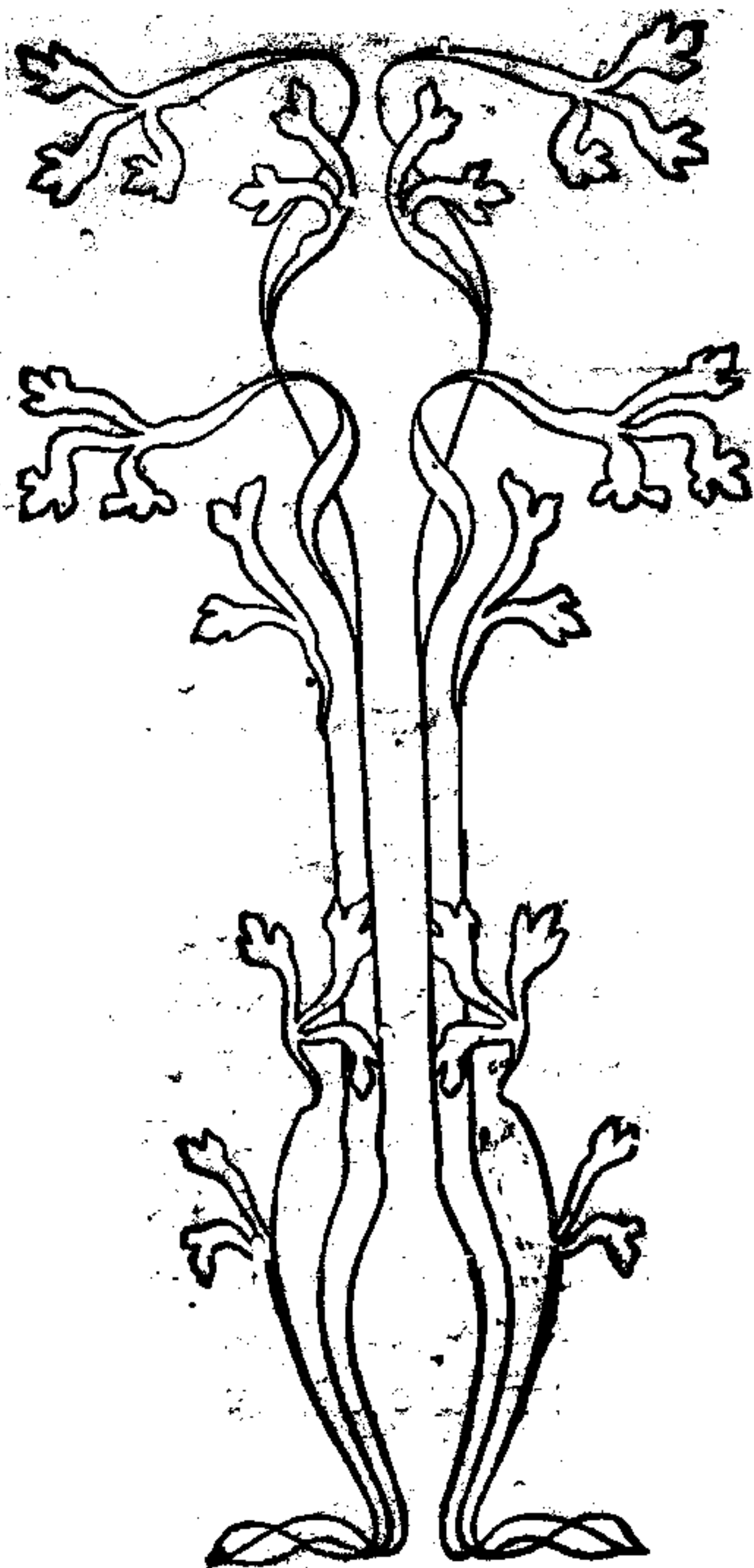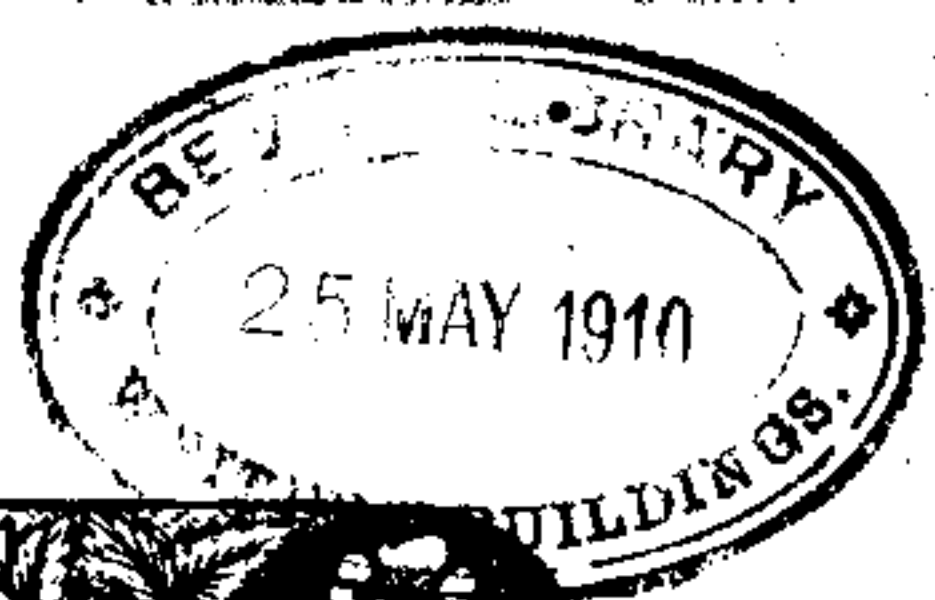
ওয়াল্‌টেয়ার—ভিজাগাপত্তন।

প্রথম কথা।

(১)

গোলমাল ও জনতাপূর্ণ কর্ম্ম-স্থল হইতে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে গিয়া শান্তি-লাভ এবং তৎসহিত উৎকৃষ্ট জলবায়ু-সংযোগে স্বাস্থ্যোন্নতি বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের সংস্কার—এই দুই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের বহির্নিবাসের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ইহার ফলে বাঙ্গালা দেশের উপকণ্ঠবর্ত্তী মধুপুর বৈদ্যনাথ গিরিদি শিমুলতলা প্রভৃতি স্থানে—যথায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী অদৃশ্য ছিল বলিলেই হয়, এক্ষণে—তথায় বহু বহু সুন্দর উদ্যানযুক্ত ক্ষুদ্র ও বড় বাটীতে পূর্ণ স্বাস্থ্য-নিলয় হইয়াছে। এই স্থানগুলির সুবিধা এই যে, উহারা উন্মুক্ত বায়ুবিশিষ্ট আর্দ্রতাশূন্য উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, সুতরাং ম্যালেরিয়া প্রভৃতির অস্পৃষ্ট, এবং দ্বিতীয়তঃ রেল-সংযোগে কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী, ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায়। ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানের ইচ্ছা হইলে দার্জ্জিলিঙ্গে যাইতে হয়। বাঙ্গালার নিম্নভূমির জলবায়ু হইতে একেবারে

সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা হইলে দার্জ্জিলিঙ্গকেই নির্দ্দেশ করিতে হয়। বায়ুপরিবর্ত্তনেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই সকলের মধ্যে কোন-না-কোন স্থানে যাইয়া থাকেন।

এক্ষণে আবার ঐ সকল স্থান ব্যতীত সমুদ্রতীরে বাসেরও প্রবৃত্তি হইয়াছে। পর্ব্বত-নিবাসে স্বাস্থ্যোন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ—তত্রত্য বায়ুমণ্ডলে "ওজোন" (ozone) নামক পদার্থের অবস্থিতি। আমাদের জীবন-রক্ষার প্রধান সহায় যে অক্সিজেন (oxygen) বাষ্প, তাহার বিশুদ্ধ ও অত্যুৎকৃষ্ট অংশবিশেষের নাম ওজোন। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সেই ওজোন সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ুতেও থাকে। তদ্ব্যতীত পাহাড়ের শীত অনেকে সহ্য করিতে পারেন না বা অনেকের ভাল লাগে না। কিন্তু সমুদ্রতীরে শীতের আধিক্য আদৌ নাই। এই কারণে এক্ষণে সমুদ্র-তীরও স্বাস্থ্য-নিবাসের জন্য আদৃত ও অবলম্বিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালা দেশে সমুদ্রতীরে বাসোপযোগী তেমন স্থান নাই। বালেশ্বর (ইহা এক্ষণে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া পরিগণিত) পুরাকালে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল, বৈদেশিক বাণিজ্য-পোত তথায় লাগিত। কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ সমুদ্র ঐ নগর হইতে ক্রমে সরিয়া এক্ষণে বহু ক্রোশ দূরে গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অবশিষ্ট সমুদয় স্থান জঙ্গল ও জলাভূমিতে পূর্ণ "সুন্দর বন"। (এস্থলে নবকল্পিত ফ্রেজরগঞ্জ উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিলাম না।)

সুতরাং সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যনিবাসের জন্য উড়িষ্যার পুরী নগরই বাঙ্গালার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থান। একে ত পুরী হিন্দু-দিগের এক মহা তীর্থ, তাহার উপর এক্ষণে স্বাস্থ্যনিবাসহেতু উহার আদর অনেক বাড়িয়াছে। পুরীতে এক্ষণে সমুদ্র-তীরে অনেক বাটী

নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। রেলসংযোগে পুরী এক্ষণে কলিকাতার অতি নিকটে আসিয়াছে, ডাকগাড়ী দ্বারা ১২ ঘণ্টা সময়ে তথায় যাওয়া যায়।

কিন্তু আর ৯ ঘণ্টা মাত্র অধিক সময় অগ্নি-রথকে দিলে, তাহা পুরী অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও অধিকতর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান ওয়াল্‌টেয়ারে পৌঁছাইয়া দেয়। এই উভয় স্থানের মধ্যে প্রথম প্রধান প্রভেদ এই যে, পুরীতে কেবল সমুদ্র আছে, কিন্তু ওয়াল্‌টেয়ারে সমুদ্র ও পাহাড় এই উভয় আছে। তদ্ব্যতীত পুরী অপেক্ষা ওয়াল্‌টেয়ারে বেড়াইবার জন্য অনেক ভাল রাস্তা, থাকিবার জন্য অনেক বাড়ী, দেখিবার অনেক অধিক দৃশ্য, খাদ্য-দ্রব্যের অধিক সুবিধা, প্রভৃতি আছে। বিশেষ, এখানকার অনতিদূরবর্ত্তী এক সীমাচল তীর্থের জন্য অসংখ্য হিন্দু এখানে আসিয়া থাকেন। সীমাচল ঐ নামের শৈল শিখরোপরিস্থ এক আশ্চর্য্য স্থান। নিম্ন হইতে চক্ষুর অদৃশ্য গুপ্ত ভাবে অবস্থান, শিখর-প্রদেশে বহু শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত সুন্দর দেব-মন্দির, বিচিত্র প্রস্তরগঠিত সোপান-মালাবিশিষ্ট সুদীর্ঘ যেন আকাশ-গামী উঠিবার পথ, পথের ধারে ধারে শৈল-নিঃসৃত দেহ-শীতলকারী নির্ঝরিণী-শ্রেণী,—এই সকল সীমাচলকে নিরতিশয় রমণীয় বা একরূপ পরীস্থান করিয়াছে। তদ্ব্যতীত কথিত আছে, যে পর্ব্বত হইতে প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু নিম্নে ফেলিয়া দেন এবং বিষ্ণু রক্ষা করেন, তাহা এই সীমাচল গিরি। এপ্রদেশীয়দের ধারণায় সীমাচলের এরূপ মাহাত্ম্য যে, অনেকে উহাকে "দক্ষিণের কাশী" বলিয়া থাকেন। পরে যথাস্থানে সীমাচলের বিস্তৃত বিবরণ দিব।

এস্থলে বিদেশ গমনমাত্রের আর এক বিশেষ উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আমাদের দেহ যেমন নানা রোগে জড়িত হইলে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইলে উপশম বোধ

হয়, বিদেশ-ভ্রমণে তেমনই আমাদের মনের যন্ত্রণাতেও শান্তি-লাভ হয়। সংসারের নানা চিন্তা জ্বালা যন্ত্রণা দ্বেষ হিংসা জীবিকার জন্য গুরু পরিশ্রম ইত্যাদি হইতে মুক্ত সৌভাগ্যবান্ মানব পৃথিবীতে কত জন আছেন জানি না। আমাদের মত সাধারণ মানবের পক্ষে ঐ সকল হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতি-লাভের ইচ্ছা হইলে একমাত্র বিস্মৃতি ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই, এবং কেবল মধ্যে মধ্যে বাহিরে যাইলেই তাহা সিদ্ধ হয়। (বিদেশ ভ্রমণে যেমন নব নব দৃশ্যে অন্তরে প্রীতিলাভ হয়, সেইরূপ সমুদয় আন্তরিক কষ্টের বিস্মৃতিতে হৃদয়ের ভার অপনীত হইয়া যেন কিছু দিনের জন্য এক সুখের নব জীবন হয়। আর বিদেশে অবস্থানে তথায় অনেকের সহিত যে সৌহার্দ্য হয়, তাহাতে সেই বাল্যকালের কুটিলতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি শূন্য নির্ম্মল আনন্দময় বন্ধুত্ব-ভাব স্মৃতিপথে আসে।)

ওয়াল্‌টেয়ার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া দেখিলাম, তৎসমুদয় অতি সংক্ষিপ্ত, তাহা পাঠে এই স্থানের স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে না এবং তদ্ব্যতীত তাহা অনেক ভ্রম ও আন্দাজী কথায় পূর্ণ। আমি এখানে বাস করিয়া যাহা দেখিয়াছি এবং স্থানীয় অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, উহা সাধারণ পাঠকের অপাঠ্য হইবে না, এবং যাঁহারা ওয়াল্‌টেয়ারে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কার্য্যে লাগিতে পারিবে।

আয়োজন ও যাত্রা।

(২)

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের কূলে ওয়াল্‌টেয়ার অবস্থিত। যখন রেল হয় নাই, তখন কলিকাতায় ষ্টীমারে চড়িয়া ভিজাগাপত্তনে যাইতে হইত এবং তাহাতে তিন চারি দিন হইতে সময়-বিশেষে পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত লাগিত! কিন্তু এখন বেঙ্গল-নাগপুর রেল হইয়া ওয়াল্‌টেয়ার ২১ ঘণ্টার মাত্র পথ হইয়াছে। মেল ট্রেণে বা ডাক-গাড়ীতে যাইলে এই সময় লাগে। প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যাইলে ৩০ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু তাহাতে দরিদ্রেরও যাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ মেল ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীরও গাড়ী থাকে। মধ্যবিত্তদিগের পক্ষে ইণ্টর-মিডিয়েট বা মধ্য শ্রেণীর গাড়ীতে যাওয়া উচিত, কারণ উহার প্রতি কামরায় পাইখানা সংযুক্ত থাকে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন হইলে কোন ষ্টেষণে নামিয়া সময় অতীত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইতে হয় না, কামরায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে যথাসময়ে নিজ দৈহিক কার্য্য সমাধা করিতে পারা যায়। কামরার ভিতর যথেষ্ট জলও পাওয়া যায়, ইচ্ছা করিলে ঘটী বা গ্লাস দ্বারা জল ধরিয়া স্নান পর্য্যন্ত করিতে পারা যায়। মধ্য শ্রেণীতে এই সুবিধা থাকায় দীর্ঘ রেল-যাত্রার প্রধান অন্তরায় ও তজ্জনিত স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতের আশঙ্কা দূর হয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এ সুবিধা

নাই। তবে স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় শ্রেণীর প্রতি সমগ্র গাড়ীতে একটী পাইখানা থাকে, ইহাতে পুরুষদের মত দরিদ্র স্ত্রী-যাত্রীদের অসুবিধা সহ্য করিতে হয় না।

হাবড়া হইতে ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেষণ ৫৪৭ মাইল দূর, রেলভাড়া মধ্য শ্রেণীতে ১১৷৷৹, তৃতীয় শ্রেণীতে ৭৵৹; ভিজাগাপত্তন ষ্টেষণ আর ২ মাইল অধিক দূরে, তথাকার ভাড়া উভয় শ্রেণীতেই এক আনা করিয়া অধিক। কিন্তু রেলগাড়ী একেবারে সরাসর ভিজাগাপত্তনে যায় না, ওয়াল্‌টেয়ারে গিয়া থামে, তথা হইতে স্বতন্ত্র গাড়ীতে চড়িয়া ভিজাগাপত্তন ষ্টেষণে যাইতে হয়, সুতরাং গাড়ী পরিবর্ত্তন ও সঙ্গে অনেক দ্রব্য থাকিলে তাহা নামান উঠানরও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এবং তদ্ব্যতীত সময়ও অধিক লাগে, কারণ অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ভিজাগাপত্তনের ট্রেণ ছাড়ে। এই কারণে ওয়াল্‌টেয়ারের যাত্রী ব্যতীত অনেক ভিজাগাপত্তনের যাত্রীও ওয়াল্‌টেয়ারের টিকিট লইয়া তথায় নামিয়া থাকেন। তবে ভিজাগাপত্তন ষ্টেষণ একেবারে ভিজাগাপত্তন সহরের সহিত সংযুক্ত; ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেষণ, ওয়াল্‌টেয়ার পল্লী এবং ভিজাগাপত্তন সহর, এই উভয় হইতেই দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

কুঁজা বা অন্য কোন আধার করিয়া পানীয় জল সঙ্গে লওয়া উচিত, কারণ বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের অধিকাংশ ষ্টেষণেই যাত্রীদিগকে জল, দিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম না। আর যথেষ্ট খাদ্য ও সঙ্গে লওয়া উচিত কারণ ষ্টেষণে ষ্টেষণে বিক্রীত মিষ্টান্ন প্রভৃতি অপাচ্য ও অখাদ্য। তবে যাঁহাদের আপত্তি নাই ও সঙ্গতি আছে, তাঁহারা ষ্টেষণের হোটেলে এক বা দেড় টাকা দিয়া খাইতে পারেন। এইরূপ হোটেল পথিমধ্যস্থ খড়্গপুর, বালেশ্বর, ভদ্রক, কটক, খুর্দ্দা, বর্‌হামপুর, এবং ভিজিয়ানাগ্রাম ষ্টেষণে আছে। কিন্তু মেল ট্রেণে যাইলে সত্বরতার সহিত কার্য্য সমাধা

করিতে হইবে, কারণ কোথাও ১৫—২০—২৫ মিনিটের অধিক সময় ঐ গাড়ী থামে না।

আমি প্রথম বার শীত কালে (সন ১৩১৪, ১৯এ অগ্রহায়ণ—ইং ১৯০৭ সাল, ৪ঠা ডিসেম্বর) রওনা হইয়াছিলাম। এ সময়ে কেহ যাইলে যথেষ্ট গরম কাপড় সঙ্গে লইবেন। কারণ রেলে গাড়ীর শার্সী খড়খড়ী সমুদয় বন্ধ করিয়া রাখিলেও রাত্রিকালে ভয়ঙ্কর শীত বোধ হয়। ওয়াল্‌টেয়ারে পৌঁছিলে অবশ্য অত গরম কাপড়ের কোন প্রয়োজন নাই।

যাঁহারা আচারবান্ অথচ নিজ হস্তে রন্ধন করিতে অভ্যস্ত বা সম্মত নহেন কিম্বা কাষ্ঠের জ্বালে রন্ধন করিতে অসমর্থ (এখানে কলিকাতার মত কোক কয়লা পাওয়া যায় না), তাঁহারা যেন একজন পাচক সঙ্গে আনেন। এই শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি সঙ্গে পাচক না আনায় খাওয়ার কষ্টের জন্য থাকিবার ইচ্ছা সত্বেও দুই চারি দিন থাকিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পাচকের জাতি সম্বন্ধে যাঁহাদের আপত্তি নাই, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে, বাঙ্গালীদের প্রণালীতে রন্ধন করিতে শিক্ষিত বা সমর্থ, এরূপ পাচক এখানে পাইতে পারেন। বেতন অধিক নহে, মাসিক ৫৲ ৬৲ মাত্র, আর স্বতন্ত্র খাওয়া দিতে হয় না। এখানকার সাধারণ পাচকদের প্রস্তুত দ্রব্য মুখে করিতে পারিবেন না, কারণ উহারা একে ত বাঙ্গালীদের রুচি মত রন্ধন করিতে পারে না, তাহার উপর এমন অসহ্য ও ভয়ঙ্কর ঝাল দেয় যে, তাহা পরিপাক দূরে থাকুক, মুখে করিবারও অনেকের সাধ্য হয় না। এখানে হিন্দু ব্রাহ্মণদ্বারা পরিচালিত অনেক হোটেল আছে, কিন্তু তথাকার খাদ্যও উপরোক্ত কারণে আমাদের অখাদ্য। বাঙ্গালা দেশের অতি পূর্ব্বভাগের অধিবাসীরা অত্যন্ত ঝালভক্ত, শুনিয়াছি "ঝালন" নামে কেবল লঙ্কার একরূপ তরকারী প্রস্তুত করিয়া খান। তাঁহারা সম্ভবতঃ

এদেশের চলিত রন্ধন খাইতে পারেন। সঙ্গে ভৃত্য আনা ভাল, তবে না আনিলেও চলিতে পারে, কারণ এদেশীয় ভৃত্য দ্বারা, কথা না বুঝিতে পারিলেও, আকারে ইঙ্গিতে, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, ইত্যাদি কার্য্য চলিয়া থাকে। তবে বাঙ্গালা-জানা ভৃত্য ও দাসীও এক্ষণে অল্প সংখ্যায় পাওয়া যায়।

আর দুই দ্রব্য সঙ্গে আনিলে ভাল হয়। প্রথম, সর্ষপ তৈল। উহা এদেশে পাওয়া যায় না, ক্বচিৎ পাইলেও বহু-মূল্য, সের বার আনা। এখানে সমুদয় ব্যঞ্জন তিলের তৈলে প্রস্তুত হয়। এই রূপ প্রস্তুত ব্যঞ্জন আদৌ বিস্বাদ বা দুষ্পাচ্য না হইলেও সর্ষপ তৈলের ব্যঞ্জনে আজীবন অভ্যস্ত ব্যক্তির নিকট উহা কেমন কেমন বোধ হইতে পারে। দ্বিতীয়, হুকায় খাইবার তামাক। বঙ্গদেশ হইতে সমাগত অনেক হুঁকার নেশাখোরের কষ্ট দেখিয়া আমি লিখিতেছি যে, যাঁহাদের ঐ নেশা আছে, তাঁহারা যেন উপযুক্ত পরিমাণ তামাক লইয়া আসেন। হুঁকা টানা এদেশে প্রচলিত নহে, এজন্য উহার তামাক পাওয়া যায় না। বহু অনুসন্ধানে দুই এক দোকানে যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা অতি জঘন্য। এখানে সকলে চুরুট খাইয়া থাকে।

পথ।

(৩)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছি, কলিকাতা হইতে মেল ট্রেণে যাওয়াই সুবিধা, কারণ তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগে। ঐ ট্রেণ সন্ধ্যা ৭টা ২৪ মিনিটের সময় হাবড়া ছাড়ে ও পরদিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় ওয়াল্‌টেয়ারে পৌঁছে। মধ্যবর্ত্তী কোলাঘাট, খড়্গপুর, বালেশ্বর, কটক, ভুবনেশ্বর, ও খুর্দ্দা ষ্টেষণ রাত্রিকালে অতিক্রান্ত হয়, সুতরাং পথিমধ্যস্থ রূপনারায়ণ, বৈতরণী, বিরূপা, প্রভৃতি নদী, এবং শৈল-শ্রেণী অন্ধকারে ও নিদ্রাবস্থাতেই অদৃশ্য হয়। একারণে তাহাদের কোন বৃত্তান্ত দিতে পারিলাম না। (প্রত্যাগমনের সময় আমি কটক ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দেখিয়াছিলাম, এবং ওয়াল্‌টেয়ার বর্ণনার অন্তে তাহাদের বর্ণনা করিব।)

খুর্দ্দা হইতে এক শাখা-রেল পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত ওয়াল্‌টেয়ারের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে (খুর্দ্দা সম্বন্ধে এক সংবাদ এস্থলে দেওয়া অনুপযোগী মনে করি না। ভারতে ইংরাজদের প্রথম অভ্যুদয়-কালে খুর্দ্দা হইতে পুরী পর্য্যন্ত ও চারি দিকের অনেকটা প্রদেশ লইয়া স্থানীয় এক হিন্দু রাজ্য ছিল।) ইং ১৮০৩ সালে মহারাষ্ট্রদের সহিত যুদ্ধকালে তৎকালীন উহাদের অন্যতম নায়ক ভোন্‌স্লেকে আক্রমণার্থ কলিকাতা হইতে এক বৃহৎ ইংরাজ সৈন্যদল উড়িষ্যার পথ দিয়া প্রেরিত হয়। ইউরোপে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম আছে, কোন পরাক্রান্ত দেশেরও যুদ্ধগামী চমূ, পথে কোন স্বাধীন রাজ্যের—তাহা অতি ক্ষুদ্র বা অতি

দুর্ব্বল হইলেও তাহার—ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ভারতে ঐ নিয়ম কখন চলে নাই, প্রবল রাজা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজার দেশের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়াছে। রঘুর দিগ্বিজয়ে কবি কালিদাস দুর্ব্বল রাজাগণের "বৈতসী বৃত্তি" (অর্থাৎ প্রবল স্রোতের পথে বেতের মত নত ভাব ধারণ) বর্ণনা করিয়াছেন; খুর্দ্দারাজেরও তাহাই অবলম্বন করা উচিত ছিল। কিন্তু ঐ উড়ে রাজার তত বুদ্ধি হইল না, তিনি নিজ ধনুর্ব্বাণ-ধারী সৈন্যগণ দ্বারা বন্দুক-কামান-বিশিষ্ট ইংরাজ-সেনার পথ-রোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, রাজার সৈন্য সকল অবিলম্বে ছিন্ন ভিন্ন হইল ও রাজ্য ইংরাজের কুক্ষিগত হইল। পরে সামান্য সম্পত্তি সহিত পুরীর মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব মাত্র রাজাকে ইংরাজ দয়া করিয়া দিল। পুরীর বর্ত্তমান রাজা, পুরীর জগন্নাথ দেব অপেক্ষা যাঁহার অধিক সম্মান, যাঁহাকে উড়িষ্যা-বাসিরা "চলন্তি বিষ্ণু" অর্থাৎ গতিশক্তিবিশিষ্ট দেহধারী বিষ্ণু বলে, তিনি সেই খুর্দ্দারাজের বংশধর।

ভারত-ইতিহাসের অসংখ্য শোক-কাহিনীর মধ্যে উপরোক্ত শোচনীয় ঘটনা, খুর্দ্দা দর্শনে, স্বতই স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য অন্তর বিক্ষুব্ধ করিল। খুর্দ্দা অতিক্রমের ক্ষণকাল পরে বিখ্যাত চিল্কা হ্রদ দর্শনে সেই মানসিক অবসাদ অন্তর্হিত হইল। চিল্কা হ্রদ অতি বৃহৎ, প্রায় ৪৪ মাইল দীর্ঘ, অনেকগুলি ষ্টেষণ পর্য্যন্ত চক্ষুর সম্মুখে থাকে। ইহা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত, এজন্য ইহার জল লবণাক্ত। চিল্কা হ্রদের দৃশ্য অতি মনোরম। মধ্যে মধ্যে ইহার অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি দেখিলে মনে হয়, যাঁহারা পৃথিবীর কল্লোল দ্বেষ হিংসা মনের যন্ত্রণা প্রভৃতি হইতে দূরে শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ঐ দ্বীপ-গুলি আশ্রয়স্থল হইতে পারে। কিন্তু নিজে না যাওয়ায় বলিতে পারি না প্রকৃতই ঐ সকল দ্বীপ বাসযোগ্য কি না। যাঁহাদের চিল্কা হ্রদ ভাল

করিয়া দেখিবার বাসনা হয়, তাঁহারা রম্ভা ষ্টেষণে অবতীর্ণ হইয়া পরের ট্রেণে পুনর্যাত্রা করেন। রম্ভা ষ্টেষণের নিকট ঐ হ্রদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে একটী সুন্দর বাটী আছে, উহার অধিকারী নিকটবর্ত্তী রাজা-উপাধিধারী এক ধনী জমিদার। তাঁহার কর্ম্মচারী রম্ভা ষ্টেষণে থাকেন। তাঁহা দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া হ্রদ-মধ্যস্থ ঐ বাটীতে যাওয়া যাইতে পারে। মুশলমান-কৃত দেব-ধ্বংসের অত্যাচার কালে পুরীর জগন্নাথ দেব এই হ্রদে আশ্রয় লইয়াছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুরা তাঁহার বিগ্রহকে এই হ্রদের জল-নিম্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। চিল্কা হ্রদের সহিত বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী শেষ হইয়াছে, এবং তাহার পর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী আরম্ভ হইয়াছে।

মেল ট্রেণ দ্বারা যাত্রীদের চক্ষে পথে আর কোন বর্ণনীয় দৃশ্য পড়ে না। বেলা ৪টার সময় মেল ট্রেণ ওয়াল্‌টেয়ারে উপনীত হয়। ইহার পূর্ব্বে সুবিধা বোধ করিলে গাড়ীর ভিতর স্নান এবং উদর পরিষ্কার ও পূর্ণ করা কর্ত্তব্য, যেন যতদূর সম্ভব অক্লান্তির সহিত গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইতে পারা যায়।

উপস্থিতি।

(৪)

প্রায় এক পূর্ণ রাত্র-দিবা রেলগাড়ীতে অবস্থান দ্বারা ক্লান্ত যাত্রী ওয়াল্‌টেয়ারে অপরাহ্ণ ৪টার সময় গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া যেমন বাহিরে যাইতে উদ্যত হইবেন, অমনই তাঁহার সম্মুখে এক বিরক্তি-জনক ব্যাপার উপস্থিত হইবে। এক দিকে কুলী ও গাড়োয়ানরা সঙ্গীয় মাল লইয়া টানাটানী ও বকাবকী করিবে, অপর দিকে এক প্লেগ কর্ম্মচারী আসিয়া বলিবে, আপনি কলিকাতা (বা বঙ্গদেশ) হইতে আসিয়াছেন, আপনার দেশ প্লেগাক্রান্ত, এজন্য এখানকার নিয়ম মত আপনাকে প্লেগের পাশ লইতে হইবে।" এই কার্য্যের জন্য ষ্টেষণের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে; তথায় গিয়া তিন খানা ফরমে নিজের নাম, পিতার নাম, জাতি, বয়স, বাটীর ঠিকানা, এখানে কোথায় থাকিবেন, ইত্যাদি লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবে। উহার মধ্যে একখানা ফরম যাত্রীকে দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লইয়া উপর্য্যুপরি দশ দিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইবেন, প্লেগ কর্ম্মচারী সেই ফরমে প্রত্যহ সহি করিয়া দিবে এবং শেষ দিন একেবারে লইবে। তখন প্লেগের সাবধানতার পালা সাঙ্গ হইয়া যাইবে এবং যাত্রী স্বাধীন হইবেন। এইরূপ প্লেগের পাশ না লইলে, অথবা লইয়া নিয়মিতরূপে দশ দিন উপস্থিত না হইলে, গুরু দণ্ডের বিধান আছে, তবে তাহা কখন কাহারও প্রতি

প্রযুক্ত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। আর প্রত্যহ হাজিরা দেওয়ার কষ্ট হইতে উদ্ধারের উপায় এক আছে—প্লেগ-পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারীকে কিছু (এক বা দুই টাকা) দিতে স্বীকার করা। যাত্রী বুঝিয়া পাঁচ দশ টাকারও দাবী হয়। এই টাকা দিলে ঐ কর্ম্মচারী নিজে প্রত্যহ যাত্রীর বাটীতে আসিয়া প্লেগের ফরমে সহি করিয়া দিয়া যাইবে। সঙ্গে রমণী থাকিলে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বা সভাপতির নিকট পত্র দ্বারা আবেদন করিলে, তিনি প্লেগ-কর্ম্মচারীকে বাটীতে যাইয়া দেখিবার আদেশ করেন।

ষ্টেষণে প্লেগের কার্য্য শেষ হইলে আগন্তককে আশ্রয়-স্থানে যাইতে হইবে। যদি কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিদ্বারা পূর্ব্ব হইতে আবাস-স্থল নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কোন চিন্তা নাই। নতুবা ছত্রে যাইতে হইবে। ওয়াল্‌টেয়ার বা ভিজাগাপত্তন উভয় ষ্টেষণ হইতেই প্রায় দেড় মাইল দূরে এই ছত্র বা ধর্ম্মশালা অবস্থিত। ছত্র বলিলেই যে কোন গাড়োয়ান তথায় পৌঁছাইয়া দিবে। ইংরাজিতে ইহাকে Turner's Choultry বলিয়া থাকে। ইহা স্থানীয় কতিপয় জমিদার ও ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে চাঁদা স্বরূপ সংগৃহীত সাতাইশ সহস্র টাকায় প্রস্তুত হইয়াছে। এই ছত্র অতি সুন্দর পাকা বাটী,—চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও পরিষ্কার উদ্যান। ছত্রে অনেকগুলি (আনুমানিক ১৬টী—আমি গুণি নাই) ঘর আছে। ঘরগুলির মধ্যে পরস্পর সম্পূর্ণ ব্যবধান আছে এবং প্রতি ঘরের সহিত তাহার স্বতন্ত্র রন্ধন স্থান সংযুক্ত আছে। ছত্রে হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর আশ্রয়ের অধিকার নাই। উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ধারে কামরাগুলি সারি সারি ভাবে অবস্থিত। উত্তরের কামরাগুলিতে কেবল ব্রাহ্মণেরা আশ্রয় পায়, দক্ষিণের কামরাগুলিতে অন্য জাতীয়েরা। দুই দিন বিনামূল্যে থাকিতে পাওয়া যায়, তাহার পর প্রতিদিন প্রতি

ঘরের ভাড়া চারি আনা হিসাবে দিতে হয়। কিন্তু কখন কখন (যদিও তাহা অতি কদাচিৎ) ছত্র পূর্ণ থাকিলে তথায় থাকিতে পাওয়া যায় না; এরূপ অবস্থায় নিকটস্থ কোন দোকানদারের গৃহে আশ্রয় লইতে হয়। ছত্রে থাকিয়া ক্রমে নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা মত বাটী ভাড়া করিয়া লইতে হয়। যাঁহাদের ইংরাজি ভাবে থাকিবার সঙ্গতি ও ইচ্ছা, তাঁহারা ওয়াল্‌টেয়ারে ক্রেমজী হোটেলে যাইতে পারেন।

সময়ে সময়ে ষ্টেষণে দালাল পাওয়া যায়; তাহারা একেবারেই সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বাটী ঠিক করিয়া দেয় এবং পরে বাজার-ঘাট দেখাইয়া দেওয়া, চাকর ঠিক করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি কার্য্যও করে। আমি এইরূপ এক ব্যক্তির সাহায্যে ষ্টেষণ হইতে নামিয়া একেবারেই বাটী পাই, এবং প্রথমাবস্থায় কয়েক দিন বাজার করা প্রভৃতিতেও সাহায্য পাই। কেবল বাটী ঠিক করিয়া দেওয়া মাত্র কার্য্যের মূল্য ।০ হইতে ৷৷০। তাহার পর দুই চারি দিন গৃহস্থালীর সাহায্য জন্য অথবা দৃশ্য দেখাইবার জন্য রাখিলে সম্ভব মত আরও দিতে হয়। কিন্তু জানিবেন, এইরূপ দালালের হাতে পড়িলে, অথবা এইরূপ দালাল সঙ্গে থাকিলে, তাহার ইঙ্গিতেই, দ্রব্যাদি ক্রয়ে এবং বাড়ী ও গাড়ী ভাড়া প্রভৃতিতে অনেক অধিক ব্যয় পড়ে। আমার নিকট যে দালাল জুটিয়াছিল, সে কথা বার্ত্তায় ভদ্র, কর্ম্মে চালাক ছিল, অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারিত। এই দালালের জন্য আমি ১৲র স্থলে ২৲ গাড়ীভাড়া, ।০র স্থলে ৷৷০ মুটে ভাড়া দিয়াছি, এবং ষ্টেষণের প্লেগ কর্ম্মচারীকে অকারণে পুরস্কার দিতে বাধ্য হইয়াছি। উহার মার্ফৎ এইরূপ অন্যায় ও দ্বিগুণ দ্বিগুণ খরচ লাগিয়াছে, তাহার উপর উহাকে ছয় দিন খাওয়াইয়া ও নগদ ৩৲ দিয়াও নিষ্কৃতি পাই নাই। কিন্তু তথাপি আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, এ প্রদেশের ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও বন্ধুহীন

নবাগত ব্যক্তির পক্ষে, খরচের কথা না ধরিলে, ঐরূপ দালালের সাহায্য বেশ সুবিধাজনক বোধ হইবে।)

দার্জ্জিলিঙ্গের জুবিলী স্যানিটেরিয়মের মত যদি এখানে খাদ্যের সহিত থাকিবার বাটীর বন্দোবস্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট কিছু দিলে খাইতে ও থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে আগন্তুকদিগের বড়ই সুবিধা হয়, অর্থাৎ সকল দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, এবং এখানে অধিক-সংখ্যক দর্শকও আসিতে পারেন। কিন্তু যিনি এই ব্যবসায় করিবেন, তাঁহার ইহাতে লাভ হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতায় কিছুই বলিতে পারি না।

অবস্থিতি।

(৫)

কোথায় বাটী লওয়া উচিত, তাহা স্থির করিতে হইলে, অগ্রে এ স্থানের একটা মোটামুটী বিবরণ জানা উচিত।

ওয়াল্‌টেয়ার ও ভিজাগাপত্তন প্রকৃত পক্ষে স্বতন্ত্র নাম মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ একই স্থান; যেমন কলিকাতার চৌরঙ্গী ও কালীঘাট। উত্তরাংশকে ওয়াল্‌টেয়ার ও দক্ষিণাংশকে ভিজাগাপত্তন বলে। কিন্তু কোথায় ওয়াল্‌টেয়ার শেষ হইয়া ভিজাগাপত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। এমন কি, যে স্থানকে সকলেই ওয়াল্‌টেয়ার বলিয়া থাকে, তাহারও অনেক বাটীতে ভিজাগাপত্তন লেখা আছে। উপরি প্রবন্ধে বর্ণিত ছত্র বা ধর্ম্মশালা, ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেষণের পূর্ব্ব দিকে প্রায় এক মাইল দূরে এবং ওয়াল্‌টেয়ার ও ভিজাগা-পত্তনের মধ্যবর্ত্তী বড় রাস্তার উপরে অবস্থিত। মোটামুটী এই ছত্রের উত্তর দিক ওয়াল্‌টেয়ার ও দক্ষিণ দিক ভিজাগাপত্তন এইরূপ মনে করিয়া লইতে হইবে।

দক্ষিণাংশ বা ভিজাগাপত্তন প্রায় সমতল সহর। বিগত লোক-গণনার প্রকাশ—এখানে প্রায় ৩৫,০০০ লোকের বাস, সুতরাং কলিকাতার মত না হইলেও এ স্থানকে জনাকীর্ণ বলিতে হইবে। সহর হেতু খাটী-

আছে, কিন্তু সেগুলি একেবারে ময়লা ও দুর্গন্ধ-শূন্য না হইলেও কলিকাতার অধিকাংশ পথ অপেক্ষা ভাল। হাঁসপাতাল আদালত প্রভৃতি ভিজাগাপত্তনে অবস্থিত। নিকটে নিকটে রাস্তার উপর জলের কল আছে। বাজার সংলগ্ন।

উত্তরাংশ বা ওয়াল্‌টেয়ার উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। ছত্র হইতে উত্তর দিকে চলিলেই দেখিবেন, ক্রমে পথ উপরে উঠিতেছে। সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২৭০ ফুট উচ্চ। বাটীগুলি পরস্পর বহুদূর ও বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থায় ওয়াল্‌টেয়ার যে ভিজাগাপত্তন অপেক্ষা কিছু অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ধনী ব্যক্তিরা প্রধানতঃ ওয়াল্‌টেয়ারে বাস করেন।

ওয়াল্‌টেয়ারের পূর্ব্বভাগ ক্রমে নিম্ন হইয়া সমুদ্রের দিকে গিয়াছে। স্থানীয় সাধারণ লোক উচ্চ উত্তরাংশকে বড় ওয়াল্‌টেয়ার এবং তাহার পূর্ব্ব দিকের ঐ নিম্ন অংশকে ছোট ওয়াল্‌টেয়ার বলে। ভিজাগাপত্তনের মত এই ছোট ওয়াল্‌টেয়ার দেশীয়দের ঘন বসতিতে পূর্ণ।

কিন্তু অপর দিকে অন্য সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিতে হইবে। ওয়াল্‌টেয়ারের অধিকাংশ স্থান ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ, সুতরাং তথায় কিছু সর্প-ভয়—বিশেষ বর্ষা কালে—আছে। ভিজাগাপত্তনে ঐ ভয় আদৌ নাই। ওয়াল্‌টেয়ারে জলের কল নাই, কূপোদক পান করিতে হইবে; অবশ্য ভাল ভাল কূপ অনেক আছে বটে; কিন্তু নিকটে জলের অভাব হেতু পানীয় দূরে থাকুক, সাধারণ গৃহ-কর্ম্ম ও স্নানাদির জন্য, লোক দ্বারা জল আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এ কারণে ওয়াল্‌টেয়ারের পথে পথে দেখা যায়, গাড়ী করিয়া জল বাহিত হইতেছে। দ্রব্যাদি ক্রয় ও প্রত্যহ খাদ্যের জন্য বাজার করিতে হইলে ভিজাগাপত্তনে যাইতে

পত্তনে থাকিলে এ সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, পথে পথে জলের কল নিকটে বাজার, যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ ৫।১০ মিনিটের মধ্যে তাহা আনা যায়। তদ্ব্যতীত সমুদ্র একেবারে পার্শ্বে, ইহাতে ভিজাগাপত্তনে প্রত্যহ সহজে সমুদ্র-স্নানের সুখ ও উপকারিতা লাভ হয়।

যাঁহারা অনেক লোক রাখিতে পারেন, অনেক খরচ করিতে সমর্থ, গোলমাল না চান, জনতা-হীন স্থানে থাকিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ওয়াল্‌টেয়ার ভাল। কিন্তু পাঁচ জনের মধ্যে যাঁহাদের বাস করা অভ্যাস, যাঁহারা নির্জ্জন স্থানকে ভয় করেন (যেমন আমাদের রমণীরা), ধনী নহেন, নিকটে বাজার—যখন ইচ্ছা রন্ধন ও ভোজনের দ্রব্যাদি চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ভিজাগাপত্তন ভাল।

আর এক কথা—স্বাস্থ্যকারিতার পরিমাণে ওয়াল্‌টেয়ারের নিম্নে অবস্থিত হইলেও ভিজাগাপত্তন একবারে যে বহু স্তর নিম্নে অবস্থিত, তাহা নহে, তাহার প্রমাণ—ওয়াল্‌টেয়ার অপেক্ষা ভিজাগাপত্তনেই অনেক অধিক ইংরাজ বা শ্বেতাঙ্গ বাস করে, তবে তাহারা তত ধনী নহে। তাহার পর আমার অবস্থান-কালে ভিজাগাপত্তনে স্থানীয় লোকদের মধ্যে, অতি দরিদ্রের মধ্যেও কোনও পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখি নাই; দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র সকলেই সুস্থ দেহে বিচরণ ও কার্য্য করিতেছে। আর ভিজাগাপত্তনের সমুদ্র-তীরে যদি বাড়ী পাওয়া যায়, তবে ত ওয়াল্‌টেয়ারের সমুদ্র-তীরের বাটীর প্রায় সমান গুণ পাওয়া গেল। ওয়াল্‌টেয়ারেও কয়েকখানা মাত্র বাটী সমুদ্রতীরে, অন্য সমুদয় সমুদ্র হইতে দূরে।

ওয়াল্‌টেয়ারে বাটীর মাসিক ভাড়া ৩০৲, ৪৫৲ হইতে ১০০৲, ২০০৲ টাকা। তবে শুনিয়াছি ২০৲ ২৫৲ টাকাতেও নাকি ছোট ছোট বাটী পাওয়া

যাইতে পারে। ভিজাগাপত্তনে অনেক ছোট বাটী পাওয়া যায়। ভাড়া মাসিক ১০৲ ১৫৲ হইতে ৩০৲ ৪০৲ পর্য্যন্ত। কিন্তু উভয়ত্রই এক মাসের কম থাকিলেও পূর্ণ এক মাসের ভাড়া দিতে হইবে।

উপরোক্ত সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া সমাগত ব্যক্তিকে এখানে তাঁহার বাটী ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

বাটী-ভাড়ার আনুষঙ্গিক আর দুইটী খরচ আছে। বাটীতে জল আনিবার লোক রাখিতে হইবে। বাটীতে জলের কলের সংযোগ করিতে এখানে দেয় না। ভিজাগাপত্তনে বাটী হইলে বাটীর অধিবাসী সংখ্যা বিবেচনায় মাসিক ২৲ ৩৲ বেতনে লোক পাওয়া যাইবে, ওয়াল্‌টেয়ারে অনেক অধিক লাগিবে। পাইখানা পরিষ্কার জন্য মেথর রাখিতে হইবে। অল্প ভাড়ার সমুদয় বাটীতে পাইখানা অর্থে দুই দিকে ইট বা পাথর দিয়া সাজান দুইটী ধাপ বুঝিতে হইবে। দিবসে একবার পরিষ্কার করাইলে মাসিক ।৵০ হইতে ॥০, দুই বারে উহার দ্বিগুণ, তিন বারে তিন গুণ লাগে।

চতুর্থ বা উপস্থিতি প্রবন্ধে যে দালালের কথা লিখিয়াছি, ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেষণে আসিয়া পৌছিবা মাত্র সে আমাদিগকে ধরে এবং একেবারে তথা হইতে লইয়া আসিয়া মাসিক ২০৲ ভাড়াতে এক বাটী ঠিক করিয়া দেয়। এই বাটীতে ৩টী শয়ন-গৃহ এবং তাহা ছাড়া রন্ধন-গৃহ স্বতন্ত্র ছিল। ঘরগুলির জানালা অতি ছোট। দ্বিতীয় বৎসর সমুদ্রের অতি নিকটে ১৫৲ টাকা ভাড়ায় একটী উত্তম ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী পাইয়াছিলাম।

এস্থলে বলা আবশ্যক, অল্প ভাড়ার বাটীতে ঐরূপ ছোট জানালা থাকে, কাহাতেও বা আদৌ থাকে না। বেশী ভাড়ার বাটী না লইলে কলিকাতার মত বড় খড়খড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট বাটী পাওয়া যায় না।

অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান সকলের তুলনায় এখনও এখানে জমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম আছে, এবং সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা কিছু জমি কিনিয়া তাহাতে নিজের মনোমত বাটী প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। বাটী প্রস্তুত করার খরচও কলিকাতা প্রভৃতি অপেক্ষা কম। সমুদ্র-তীর-বর্ত্তী জমির—জমি পাওয়া যাইলে—প্রতি কাঠার মূল্য এক্ষণে এক শত হইতে দুই শত টাকা। ভিতরে কম। কিন্তু মূল্য দ্রুত গতিতে বাড়িতেছে। শুনিলাম, বৎসর দুই পূর্ব্বে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী এক খণ্ড জমি এখানকার এক ব্যক্তি ১৬০৲তে কিনিয়াছিল, উহাকে ১,৫০০৲ টাকা দিয়া সম্প্রতি এক বাঙ্গালী ঐ জমি লইয়াছেন। নব সংস্থাপিত সকল স্বাস্থ্যোপনিবেশ সম্বন্ধেই ঐরূপ দেখা যায়। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ কোন কোন জমি ১৬৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল, এখন তাহাদের মূল্য লক্ষাধিক হইয়াছে।

খাদ্য।

(৬)

প্রথমেই বলি—বড় মানুষী ভাবে না চলিলে, মোটের উপর এখানে খাওয়া খরচ, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি অন্য সকল স্বাস্থ্য-নিবাস অপেক্ষা এবং কলিকাতা অপেক্ষা, কম পড়ে। দীর্ঘ কাল বাসের পক্ষে অথবা বহু পরিবার বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ইহা এক বিশেষ সুবিধা। আর বড় মানুষেরা প্রত্যহ তাঁহাদের দ্রব্যাদি রেল পার্শেল যোগে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইয়া লইতে পারেন। ফল তরি তরকারী প্রভৃতির ১০ সের ওজনের রেল ভাড়া ৷৷০ মাত্র, অন্যান্য দ্রব্যের ১৲।

এখানে তরকারীর মধ্যে গোল আলু, বিলাতী কুমড়া, লাউ, বেগুণ, সীম, কাঁচকলা, সাদা আলু, পিঁয়াজ, ঢেঁড়শ, ধুন্দুল, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, প্রভৃতি পাওয়া যায়। গোল আলুর মুল্য কলিকাতার মত, কিন্তু আমদানী না থাকিলে মুল্য অধিক হয়। অন্য সকল তরকারী অতি সুলভ, কতকগুলির কলিকাতার সিকি দাম; যথা, কলিকাতায় ৵০ আনার কুমড়া এখানে ৴০, লাউ ৵০র স্থলে দুই পয়সা। যে সময় কলিকাতায় পিঁয়াজের সের দুই তিন আনা, সে সময়ে এখানে দুই তিন পয়সা। পাতি লেবু পয়সায় ৮।১০টা। বিলাতী কুমড়া বাঙ্গালা দেশের মত লাল নহে, কিন্তু অনেক অধিক মিষ্ট। সাদা আলু মিষ্ট সুখাদ্য ও সুলভ,

এবং বাজারে কাঁচা ও সিদ্ধ উভয় প্রকার বিক্রয় হয়। বেগুণ আকারানুসারে পয়সায় ২।৩টা হইতে ৮।১০টা পর্যান্ত, কিন্তু ভাল নহে। * বাঁধাকপি ফুলকপি প্রভৃতি আদৌ পাওয়া যায় না। পান পাওয়া যায়, দাম অধিক, মিঠে পান পাওয়া যায় না।

আমি শীত কালে আসিয়াছি, এ সময়ে এখানকার বাজারে কমলা লেবুই প্রধান ফল দেখিতেছি। আতা ও পেঁপে সকল দিন বাজারে আসে না, কিন্তু আসিলে বেশ সস্তায় পাওয়া যায়, যথা কলিকাতার দুই তিন আনার পেঁপে এখানে দুই তিন পয়সায় এবং আতা পয়সায় দুই হইতে চারিটী বিক্রয় হয়। † বাঙ্গালা দেশের মত চাঁপা ও মর্ত্তমান কলা পাওয়া যায়। আর এক প্রকার লাল কলা পাওয়া যায়, এমন সুস্বাদু ও এত মিষ্ট কলা কখন পূর্ব্বে দেখি নাই, ইহা খাইবার পর জল না খাইয়া থাকিতে পারা যায় না; কিন্তু ইহার দাম অত্যন্ত অধিক, প্রতি কলা দুই হইতে চারি পয়সা। আনারস অজস্র পাওয়া যায়, উহা সুলভ কিন্তু তেমন ভাল নহে। পেয়ারা টোপা কুল প্রভৃতি যথেষ্ট। আম অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। মাঘ মাস হইতে উহা দেখা দেয়। এদেশকে নারিকেল গাছের বন বলিলে চলে, এত নারিকেল গাছ বাঙ্গালা দেশেরও কোথাও নাই,

---

* পর বৎসর এখানে আসিয়া দেখিলাম, অজন্মা হেতু প্রায় সমুদয় তরকারীর মূল্য অধিক হইয়াছে।

† আতাকে এদেশে সীতাফল বলে। কুক্কুটের অপর নাম রাম পাখী। এই দুই বিচিত্র নাম দেখিয়া মনে উদয় হইতে পারে না কি যে, রামচন্দ্র বনবাস কালে ভারতের এই সকল দক্ষিণ ও তৎকালীন জঙ্গলময় প্রদেশে অবস্থানের সময় কুক্কুট (না হয় বন্য কুক্কুটই হইল—আর কুক্কুট মাংস এ দেশে চলিত) খাইতেন, আর অনায়াস-লভ্য আতা ফল সীতা দেবীর প্রিয় পদার্থ ছিল, এবং সম্ভবতঃ তাহাতেই ঐ দুই নামের উদ্ভব হইয়াছে?

অথচ কেন বলিতে পারি না নারিকেলের দাম কলিকাতার মত অর্থাৎ দুই তিন পয়সা। নারিকেলের ন্যায় তাল ও খেজুর গাছও অসংখ্য, কিন্তু উহাদের ফলের কোন চিহ্ন দেখি নাই। তবে তাড়ী খুব দেখিতে পাওয়া যায়। খেজুর রস এক বিন্দুও পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ উহা তাড়ী ভাবে প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়। উচ্চ স্তরের ফল আঙ্গুর বেদানা প্রভৃতি চক্ষুর অদৃশ্য।

চাল ও ডাল সকল প্রকার পাওয়া যায় জিনিস ভাল এবং মূল্য কলিকাতা অপেক্ষা কম কিন্তু সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বালির দেশের দ্রব্যহেতু উহাতে বালি থাকে, সুতরাং রন্ধনের পূর্ব্বে ভাল করিয়া বাছিয়া লওয়া উচিত। সিদ্ধ চাল পাওয়া যায় না, সমুদয় আতপ। যে চালের মূল্য কলিকাতায় ৯৲ দেখিয়াছি, ঠিক সেইরূপ এখানে ৬৲ মণ হিসাবে কিনিয়াছি। কলিকাতায় ৭৷৷০—৮৲ দরের চালের মূল্য এখানে ৫৲—৫৷৷০। সোণা মুগের মণ ৪৲ ৪৷৷০। *

[এই সকল দ্রব্য ক্রয়ে নবাগত ব্যক্তির নিম্ন তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। এখানে মণ দরে বিক্রয় নাই, টাকায় এত সের—এইরূপ বিক্রয় হয়। বাজারে গিয়া এই চালের মণ কত, এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে চলিবে না, টাকায় কত সের জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। (আমি উপরে যে চাল ও ডালের মণ দর দিয়াছি, তাহা টাকার সের দর হইতে হিসাব করিয়া বলিয়াছি।) তাহার পর, এখানে আমাদের দেশের সের নাই, ইংরাজি পাউণ্ড ওজন চলিত। ৩৯ তোলায় ১ পাউণ্ড হয়। সুতরাং ১ সের চাহিলে ২ পাউণ্ড ওজন দেয় এবং তাহাতে আমাদের ২ তোলা কম পড়ে।

* পর বৎসর কিন্তু ইহার বিপরীত দেখিলাম। দেখিলাম, এ প্রদেশে অজন্মা হেতু চালের দর কলিকাতা অপেক্ষা অধিক, এবং উদরের জ্বালায় বহু সহস্র দরিদ্র মজুরীর জন্য রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

কিন্তু কতকগুলি দ্রব্য যথা চাল ডাল ঘৃত প্রভৃতি, মাপে বিক্রয় হয়, এবং সেই মাপের প্রতি সেরে ওজনের এক সের দুই ছটাক হয়। সুতরাং টাকায় ৮ সের দর হইলে প্রকৃত ৯ সের পাওয়া যায়। কিন্তু মূল ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে লইলেই ঐ সুবিধামত পাওয়া যায়; সাধারণ দোকানদারদের নিকট হইতে লইলে তাহারা ওজন করিয়া মাল দেয়, অর্থাৎ ৮ সের দর হইলে ওজন করিয়া ঠিক ৮ সেরই দেয়। আবার যে সকল দ্রব্য হাল্‌কা, যথা ময়দা, দোকানদারেরা তাহা ওজনের পরিবর্ত্তে মাপে চালাইতে চেষ্টা করে। যথা আটা বা ময়দার মাপের এক সের ওজন করিলে ১৩ ছটাক মাত্র হয়। সুতরাং উহা ওজন করিয়া কিনিবেন। কতকগুলি দ্রব্য "ভিশ" দরে বিক্রয় হয়। ১২৫ তোলায় "ভিশ" হয়, কিন্তু খুজরা বিক্রয় কালে দেড় সের (১২০ তোলা) বা ৩ পাউণ্ডে (১১৭ তোলা) ভিশ ধরে। আমি এক দিন বাজারে এক দোকানে গুড়ের দর জিজ্ঞাসা করায় সের ।০ বলিল। তাহার পর মূল ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়া ।/০ হিসাবে ভিশ ক্রয় করিলাম, ইহাতে ৵১০ হিসাবে সের পড়িল অর্থাৎ বাজার অপেক্ষা সের প্রতি দুই পয়সা কম হইল।]

আটা এদেশে জাঁতা-ভাঙ্গা বিক্রয় হয়। কলের ময়দা কলিকাতা হইতে আমদানী হয়। চিনিও কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী হয়। সুতরাং এই দুই দ্রব্যের মূল্য কলিকাতার অপেক্ষা কিছু অধিক।

সর্ষপ তৈল এখানে পাওয়া যায় না। কচিৎ পাইলেও মূল্য অধিক, সের ৸০। এ কারণে ইত্যগ্রে (৮ পৃষ্ঠায়) "আয়োজন ও যাত্রা" প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, উহা সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে। এখানকার লোকে তিলের তৈলে পাক করিয়া থাকে। এইরূপ প্রস্তুত ব্যঞ্জন আদৌ

বোধ হইতে পারে। কিন্তু দুই এক দিন খাইলেই অভ্যাস হইয়া যায়। আহারের রুচি কত দেশে কত প্রকারই না আছে! বোম্বে অঞ্চলে নারিকেল তৈলে পাক করিয়া থাকে, উহা শুনিলেই আমাদের ঘৃণা হইবে, কিন্তু তত্রত্য লোকদের উহাই প্রতিদিনের চলিত আহার!

ঘৃত কলিকাতা অপেক্ষা শস্তা ও সাধারণতঃ উত্তম। বাজার দর টাকায় পাঁচ পোওয়া। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ঘৃত প্রয়োজন হইলে, মাখন কিনিয়া গলাইয়া লইতে হইবে, মাখন টাকায় পাঁচ পোওয়া। উহা হইতে ১ সের ঘৃত হয়। ঘৃতে ভেজাল দেওয়ার প্রধান প্রচলিত দ্রব্য বাদাম তৈল—তাহা এখানে আদৌ পাওয়া যায় না। তবে অপকৃষ্ট ঘৃতে তিলের তৈল মিশ্রিত থাকে, কিন্তু তাহা সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু এই তিল-তৈল-মিশ্রিত ঘৃতও যে কলিকাতার বাদাম-তৈল-মিশ্রিত—চর্ব্বি-মিশ্রিত দূরে থাকুক—ঘৃতের ন্যায় দুর্গন্ধ ও অজীর্ণকর নহে, তাহা বলা বাহুল্য।

বাঙ্গালা দেশের ঘৃত-ব্যবসায়ীদের মত এদেশে "মোকাম" হয় নাই, যে নানা ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত ঘৃতে চর্ব্বি মিশাইয়া একত্র জ্বাল দিয়া ঘৃতের আকার করিবে। গোঁড়া হিন্দু মাড়ওয়ারীও টাকার লোভে এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত।

এখানে সন্দেশ পাওয়া যায় না, কারণ ছানা প্রস্তুত হয় না বা লোকেরা প্রস্তুত করিতে জানে না। বাজারে ময়রার দোকানে যে ক্ষীর ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রস্তুত জলখাবার পাওয়া যায়, তাহা মন্দ না হইলেও কলিকাতার মত অত নানা প্রকারের নহে। সাধারণতঃ প্রতি সের ৷৷০।

স্থানীয় লবণ সুলভ, সের ৴০, কিন্তু বালি-মিশ্রিত। এ কারণে কোন তরকারীতে দিবার পূর্ব্বে ঐ

পড়িবে। উহা বাদ দিয়া বাকী উপরের খাঁটী লবণ-জল পাত্রে দিতে হইবে। নতুবা শুষ্ক ভাবে লবণ দিলে তাহার বালির জন্য প্রস্তুত ব্যঞ্জন খাইতে বড়ই কষ্ট হয়। সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়, এবং তাহাতেই আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহার মূল্য বড় বেশী, সের চার আনা। যাঁহারা কিছু দীর্ঘ কাল এস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সর্ষপ তৈলের সহিত লবণও যেন সঙ্গে লইয়া আসেন।

বেণে মশলা প্রায় সকলই পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে কতক-গুলির মূল্য অধিক, যথা ছোট চিকি সুপারী (ভাল সুপারী পাওয়া যায় না) পয়সায় দুইটী। অপর, হরিদ্রা লঙ্কা প্রভৃতি শস্তা।

সম্মুখে দোআ খাঁটী গো-দুগ্ধের সের টাকায় ৬ হইতে ৮ সের। কলিকাতায় আমরা গয়লার নিকট হইতে খাঁটী বলিয়া টাকায় ছয় সের পরে পাঁচ সের হিসাবে কিনিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও জল-মিশ্রণ-শূন্য দুগ্ধ না পাওয়ায় কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে টাকায় ৪ সের অর্থাৎ সের।০ হিসাবে ক্রয় করিতে থাকি। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে কোন ভেজাল দ্রব্য স্থান পায় না; তত্রত্য দুগ্ধ-বিক্রেতারাও বলে, তাহারা বিন্দুমাত্র জল মেশায় না, অথবা জল-মিশ্রিত দুগ্ধে বাতাসা দিয়া খাঁটীর মত চেহারা করে না; অথচ ঐ খাঁটী দুগ্ধ অপেক্ষা এখানকার খাঁটী দুগ্ধ অনেক ভাল ও ঘন। কলিকাতার খাঁটী দুগ্ধ এক সের মারিলে আনুমানিক অর্দ্ধ পোওয়া মাত্র ক্ষীর হয়, তৎস্থলে এখানকার এক সের দুগ্ধে প্রায় অর্দ্ধ সের ক্ষীর হয়। আবার এখানকার সেরের পরিমাণও অধিক, কলিকাতার প্রায় পাঁচ পোওয়ার সমান। কলিকাতার বাজারের সাধারণ দুগ্ধের ন্যায় অখাঁটী দুগ্ধও গোয়ালিনীরা বাড়ী বাড়ী বেচিয়া যায়, প্রতি সের দুই তিন পয়সা মাত্র। দুগ্ধ শস্তা হেতু দধিও শস্তা, কলিকাতার চারি পয়সার দধি এখানকার এক পয়সার তুল্য।

বাঙ্গালীদের পক্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী রমণীদের পক্ষে, এখানকার মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোভের বস্তু। সমুদ্রের লবণ-জলের মৎস্য হেতু এখানকার প্রায় সমুদয় মৎস্যেরই অত্যন্ত ভাল স্বাদ অথচ মূল্য অতি কম। রোহিত মৎস্যের আকারের কিন্তু ভেটকীর স্বাদের এক প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়, তাহার গাত্রে কাঁটার মত গঠন এবং পুচ্ছ বড়। কিন্তু ভিতরে কাঁটা না থাকায় ইহা ছুরী কাঁটা দ্বারা ভোজনকারী সাহেবদের প্রিয়। ভেট্‌কীও এই কারণে সাহেবেরা ভাল বাসে। ইলিষ মাছের মত ঠিক দেখিতে এক প্রকার মাছ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার স্বাদ ইলিষের পরিবর্ত্তে ভেট্‌কীর মত। এই তিন মৎস্য বাদে অন্য সকল মৎস্য এত সুস্বাদু অথচ কোমল যে, কলিকাতার লোকের তাহার কোন ধারণা হইতে পারে না। এমন কি, চিঙ্গড়ী ও কাঁকড়াও—তাহা কলিকাতার মত "ঘী-ওলা" না হইলেও—কলিকাতার অপেক্ষা সুস্বাদু ও কোমল। মাছের বাজারে যাইলে প্রায়ই নূতন নূতন মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ বিশাল সমুদ্রে কোন্ দিন কোন্ মৎস্য ধরা পড়ে, তাহার ঠিক নাই। এক দিকে সম্মুখে সমুদ্রে টাটকা ধরা অথচ সুস্বাদু মৎস্য, তাহার উপর আবার মূল্যও আশাতীত সুলভ, ইহাতে কলিকাতা হইতে নবাগত পরিবারের মৎস্য-ক্রয়ের লোভ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। মৎস্য ওজন দরে বিক্রয় হয় না, থাউকো দরে বিক্রয় হয়। কত সুলভ, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলি, উপরোক্ত রোহিত মৎস্যের আকারের মৎস্য, প্রায় দেড় সের ওজন, এক দিন ।৹ মাত্রে ক্রয় করি। আর এক দিন এক পায়রাচাঁদা ৵৹য় কিনিয়াছিলাম, তাহা কুটিয়া ল্যাজা ও মুড়া বাদে বড় বড় ২০ খানা মাছ হইয়াছিল। কত বড় পায়রা-চাঁদা ও কেমন সুলভ, তাহা বুঝুন। মৌরলা ও ছোট চিংড়ী মাছ এক পয়সায় যাহা পাওয়া যায়, [illegible]

মধ্যে মধ্যে হাঙ্গরের শিশু ধরা পড়িয়া কর্ত্তিত হইয়া মৎস্যের মত বিক্রয় হয়। ইহা বিস্বাদ নহে এবং পাক করিয়া খাইলে বাত-রোগীর বাত ভাল হয়।

মাংস প্রভৃতিও অতীব শস্তা। পাঁঠা ও ভেড়ার মাংসের সের ।/০। যে মুরগীর মূল্য কলিকাতায় ৷৷০—৷৷৵০, তাহা এখানে ৶০—৷০। কলিকাতায় মুরগীর ডিমের মূল্য দুই আড়াই তিন পয়সা, এখানে এক পয়সা মাত্র বা তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক বা ৪ পাই মাত্র।

পরিশেষে বলি, অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্ট ঘৃত দুগ্ধ মৎস্য মাংস প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইবার যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাঁহারা যেন এই ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তনের মত স্থানে আগমন করেন।

উপরোক্ত ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়ার্থ এবং বাজারে বিক্রেতা ও বাটীতে ভৃত্যাদির কথা বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যের এদেশীয় নাম প্রভৃত পরবর্ত্তী ২১ অধ্যায় বা "কথা ও ভাষা" প্রবন্ধে দিব।
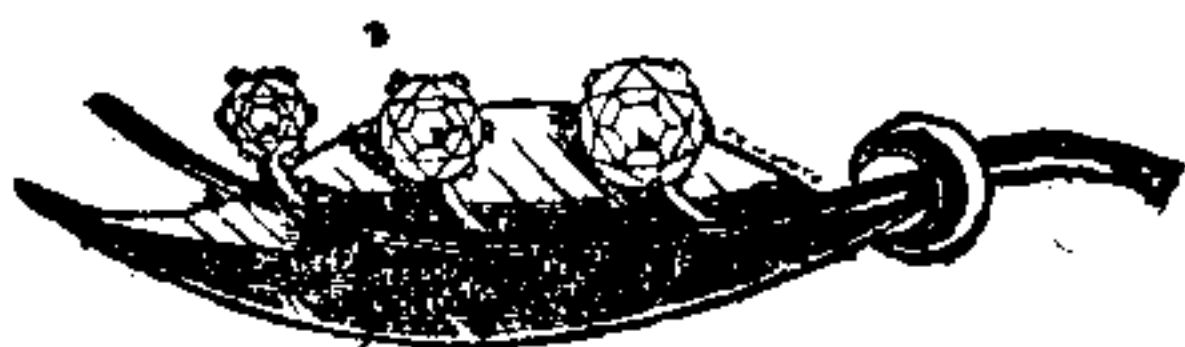
স্থানের গুণ।

(৭)

গত প্রবন্ধে আমি খাদ্যের লোভ দেখাইয়াছি; কিন্তু তাহা অপেক্ষা স্বাস্থ্যকারিতা গুণে ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজাগাপত্তনের গরিমা অনেক অধিক। একমাত্র স্বাস্থ্য-লাভের জন্য অনেক লোক এখানে প্রতি বৎসর আসে।

দেশের অভ্যন্তরবর্ত্তী স্থান সকল অপেক্ষা সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান সকল—অন্য কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে—সাধারণতঃ অধিকতর স্বাস্থ্যকর হয়, কারণ সমুদ্র হইতে প্রবহমান বিশুদ্ধ বায়ু তীরস্থ স্থান সকলের বায়ু-মণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখে। এখানে বর্ষা কালে, কলিকাতার মত, বায়ু জল-সিক্ত হইয়া থাকে না। কলিকাতার শীত কালের ধূম-পূর্ণ প্রথম রাত্রি এবং হিম ও কুয়াসা বিশিষ্ট শেষ রাত্রি ও প্রাতঃকাল—এখানে কখন দেখা যায় না; এই শীত কালে এখানকার আকাশ ও বায়ু সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কলিকাতায় শীত কালে ঐ ধূমে রাস্তা অন্ধকার হয়, এমন কি উহার জন্য সময়ে সময়ে রুদ্ধ-দ্বার গৃহের অভ্যন্তরস্থ আলোকও অপরিস্ফুট হয়, চক্ষু জ্বালা করে, এবং হাঁপানী-রোগীদের অসুখ বাড়ে।

নর-দেহের অনেক অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ—বায়ুর আর্দ্রতা বা dampness; এখানকার বায়ুতে সে দোষ নাই। বায়ু আর্দ্রতা-শূন্য হেতু এখানে কোনও ভক্ষ্য দ্রব্য শীঘ্র পচে না বা দুর্গন্ধ হয় না। আমার নিজ অভিজ্ঞতায় ইহার এক প্রত্যক্ষ অথচ সহজ প্রমাণ পাইয়াছি। কলিকাতায় এক বাক্স আঙ্গুর কিনিলে, তাহা ৩।৪ দিনের অধিক রাখিয়া

খাইতে পারা যায় না, অভুক্ত ফলগুলি পচিয়া যায়। আমি কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কিছু কাঁচা দেখিয়া এক বাক্স আঙ্গুর সঙ্গে আনিয়াছিলাম, উহার ফল ১৫ দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল, তবে কিছু শুষ্কমত হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, সমুদ্রের জল-বায়ু তীরবর্ত্তী স্থান সকলে সমুদয় ঋতুরই প্রতাপ নাশ করে, অর্থাৎ কোন ঋতুকেই প্রবল হইতে দেয় না। পৌষের প্রবল শীতে মকর-সংক্রান্তিতে পুরীতে গিয়া গরম কাপড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কংগ্রেস উপলক্ষে পৌষ মাসে বোম্বাই সহরে গিয়া রাত্রে জানালা খুলিয়া শুইয়াছি ; এখানেও সেই সময়ে এক্ষণে ঠিক সেইরূপ করিতেছি। এখানে তিন ঋতু—শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এবং উহাদের কেহই প্রবল নহে। এখানে বর্ষায় কলিকাতার ৩ ভাগের ১ ভাগ বৃষ্টি হয় ; গ্রীষ্মে রাত্রিতে বাহিরে শুইতে হয় না এবং দিবসে পথে রৌদ্রে মাথা ফাটে না ; শীতে কলিকাতার ফাল্গুনের মত সামান্য গরম কাপড় প্রয়োজন হয় ; বোধ হয়, যেন এখানে চির বসন্ত বিরাজমান, এবং ঐ তিন ঋতু সেই এক বসন্তেরই যেন তিন বিভাগ। শীতে কাতর ও গ্রীষ্মে ভীত, উভয় প্রকার লোকেরই পক্ষে তুল্যরূপে এই স্থান সুখের নিবাস।

তাহার পর, যেমন তিন ঋতুর পরস্পর বিভিন্নতা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের অপেক্ষা অনেক কম, সেইরূপ এখানে প্রতি দিবা রাত্রের শীতোত্তাপের বিভিন্নতাও অল্প। এই বিভিন্নতা বৎসরের অধিকাংশ দিন দুই ডিগ্রী মাত্র হয়, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কাল অপেক্ষা রাত্রিকাল দুই ডিগ্রী মাত্র অধিক শীতল হয়। কলিকাতায় দিবা রাত্রের মধ্যে ১০ ডিগ্রী ও সময়ে সময়ে তাহার অধিকও প্রভেদ হইয়া থাকে।

উপরিবর্ণিত ঋতুগুলির এবং প্রতি দিবা-রাত্রের শীতোত্তাপের বিশেষ বিভিন্নতার অভাব বা প্রায় সমতার জন্য, পুরাতন ব্রংকাইটিস হাঁপানী যক্ষ্মা প্রভৃতি সকল প্রকার কাশ রোগীদের পক্ষে এই স্থান সর্ব্ব সময়—

বিশেষ শীত কালে—এক আশ্রয়-স্থল হইয়াছে। এখানে অতি অল্প দিন থাকিলেই ঐ সকল রোগের যন্ত্রণা কমিয়া গিয়া প্রত্যক্ষ উপকার দৃষ্ট হয়। একারণে নানা স্থানের ঐ সকল রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ এখানে আসিয়া অল্পাধিক কাল –২।৪ মাস হইতে ২।৪ বৎসর—বাস করেন, এবং অনেকে বিশেষ উপকার লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন।

আমি বাল্যকাল হইতে হাঁপানী রোগ-গ্রস্ত। এখানে আসিবার পূর্ব্বে এবার উহা এত বাড়িয়াছিল যে, শেষ কালে বাটীর একতল হইতে দ্বিতলে যাইতে হইলে কষ্ট বোধ হইত, এবং অনেক রাত্রি আদৌ শুইতে পারিতাম না। কিন্তু এখানে আসিবার তিন দিন পর হইতে হাঁপানী একেবারে স্থগিত হইয়াছে; রাত্রিতে ভোজন (যাহা কলিকাতায় পারিতাম না) ও অব্যাঘাতে নিদ্রা লাভ, দিবসে প্রাতে বাইসিকলে ১০।২০ মাইল ভ্রমণ, অপরাহ্নে পদব্রজে ৪।৫ মাইল (৮।১০ মাইলও হইয়াছে) বেড়ান, পাহাড়ে উঠা, এই সকল করিতে পারিতেছি। পুরাতন হাঁপানী রোগ আরোগ্য হইবার নহে, তবে ইহা যে এখানে স্থগিত আছে, তাহাতেই আমি অত্যন্ত আরাম লাভ করিতেছি।

বাঙ্গালা দেশের অনেক যক্ষ্মা-রোগী এখানে আসে। অধিক দিনের পীড়া না হইলে বেশ আরাম লাভ হয়, ক্রমে জ্বর ছাড়ে, শরীরে বলাধান হয়, খাইবার ও বেড়াইবার শক্তি হয়। কিন্তু ঐ রোগগ্রস্ত অনেক লোকের এখানে আসা হেতু কাহারও কাহারও মনে ধারণা হইয়াছে যে, ওয়াল্‌টেয়ার যক্ষ্মা-রোগীতে একেবারে পরিপূর্ণ. ঐ রোগ সংক্রামক, সুতরাং তথায় যাওয়া বিপজ্জনক। এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। দশ কুড়ি জন (এতও সকল সময় হয় না) যক্ষ্মা-রোগীতে এত বড় ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজাগাপত্তন কখন পুরিয়া যাইতে পারে না। আর এ দেশীয়দের মধ্যে ঐ রোগ আদৌ দেখি নাই। যদি পূর্ব্বে কোন যক্ষ্মা-রোগী বাস

করিয়াছিল, এইরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে বাটী প্রবেশের পূর্ব্বে তাহার ভিতরে চুণকাম করিয়া লইবেন; সামান্য ব্যয়ে উহা সমাধা হইবে, এবং সমুদয় আশঙ্কা দূর হইবে।

কেহ কেহ বলেন, এখানে পেটের অসুখ হয়, এবং কাহারও কাহারও হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, খাওয়ার অত্যাচারই ঐ পেটের অসুখের কারণ। বরং জানা গিয়াছে, অন্যত্র হইতে আনীত পেটের অসুখ এখানে নিয়মিতাচরণে ভালই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিব। অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে সমুদ্রের বায়ু-সেবন ও সমুদ্র-জলে স্নান চিকিৎসা-শাস্ত্রের এক ব্যবস্থা।

বাত বহুমূত্র ও শিরোরোগেও সুফল দান সম্বন্ধে এ স্থানের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে।

এখানকার বায়ুর উপকারিতার এক প্রধান কারণ—উহাতে ওজোনের (Ozone) অবস্থিতি। বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজেন (Oxygen) নামক পদার্থ আছে, তাহার উপর মনুষ্যের জীবন একান্ত নির্ভর করে। সেই অক্সিজেনের উৎকৃষ্ট সার ভাগের নাম ওজোন। উহা অল্লাধিক পরিমাণে সকল সময়েই সমুদ্র-জলের উপরিস্থ বায়ু-মণ্ডলীতে থাকে। কিন্তু ভারত মহাসাগর হইতে আগত দক্ষিণ বায়ুতে উহা অধিক পরিমাণে থাকে; এই কারণে যখন দক্ষিণ বায়ু বহে, সেই সময়ে এখানে অবস্থানে অধিকতর উপকার হয় ও শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়।

মোটের উপর, বায়ু ও ঋতুর গুণে এখানে সাধারণতঃ শারীরিক প্রায় সকল অবস্থার লোকেরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও তাহার উন্নতি হয়; এবং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ প্রদেশে রোগের প্রাদুর্ভাব অতি অল্প, এমন কি, অতি নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যেও অসুস্থতা বিশেষ দেখা যায় না।

স্বাস্থ্য।

(৮)

এখানে থাকিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির কামনা করিলে নিম্ন-লিখিত তিনটী নিয়ম মত চলিতে হইবে।

প্রথম, পরিমিতাহার।—কোন কোন লোকের মুখে এ স্থানের এক কলঙ্কের কথা শুনা যায় যে, এখানে ভাল হজম হয় না, পেট খারাপ করে। যাঁহারা এইরূপ অভিযোগ করেন, অনুসন্ধানে তাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যে দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের অসুস্থতার কারণ—এ দেশের জল-বায়ু নহে, তাঁহাদের লোলুপতা ও অমিতাচারিতা। শরীর ভাল করিব বলিয়া কোন ভাল স্থানে আসিয়াই আহারের কোন ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকিব না, যাহা ইচ্ছা যত ইচ্ছা খাইব—ইহা কখন হইতে পারে না। এক মাত্র উৎকৃষ্ট বায়ুই একেবারে অব্যর্থ ঔষধ নহে যে, তাহার বলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব।

পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ বা "খাদ্য" প্রবন্ধে এ দেশের মৎস্যের অসাধারণ সুস্বাদুতা ও তৎসহিত মহা সুলভতার কথা বলিয়াছি। সেই লোভে পড়িয়া, কলিকাতা প্রভৃতি মৎস্য-দুর্লভ স্থান হইতে সমাগত কোন কোন মৎস্য-প্রিয় ব্যক্তি এখানে অত্যধিক পরিমাণে মৎস্যাহার করেন, এবং অচিরে উদরাময়-গ্রস্ত হন, কারণ সমুদ্রের মৎস্য অত্যন্ত "তৈল" বিশিষ্ট ও সেই জন্য অতি গুরু-পাক দ্রব্য। আমার দলের প্রায় সকল ব্যক্তিই এই কারণে এখানে আসিয়াই প্রথমে উদরাময়ে ভুগিয়াছিল। এখানে আসিয়া

শারীরিক অবস্থা বিশেষে মৎস্য একেবারে পরিত্যাগ, অথবা প্রথম প্রথম অতি অল্প পরিমাণ আহার এবং তাহার পর সহ্য হইলে ক্রমে পরিমাণ বাড়ান উচিত। মৎস্যের পরিবর্ত্তে মাংস স্বচ্ছন্দে আহার করা যাইতে পারে, কারণ মৎস্যের ন্যায় এখানকার মাংসের কোন অপকারিতা বা অন্য স্থানের মাংস হইতে বিভিন্নতা নাই। দুগ্ধও বিশুদ্ধ ও অতি ঘন। ইহার বর্ণনাও পূর্ব্ববর্ত্তী "খাদ্য" প্রবন্ধে আছে। যাঁহাদের পরিপাক-শক্তি কম এবং কলিকাতায় যাঁহারা দুগ্ধের নামে দুগ্ধের বর্ণ-বিশিষ্ট জল পান করেন, তাঁহাদের পক্ষে এখানকার দুগ্ধ পরিপাক করা কঠিন। সুতরাং, হয় এখানে অল্প পরিমাণ খাঁটী দুগ্ধ, নতুবা তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশাইয়া নিজের পরিপাক-শক্তি-মত, পান করা কর্ত্তব্য।

এ প্রদেশ পেটের অসুখ উৎপাদন করা দূরে থাকুক, বরং তাহা ভাল করিয়া দিয়াছে, এরূপও দেখা যায়। আমার পরিচিত এক ব্যক্তির দশ বৎসর-বয়স্ক পুত্র কলিকাতায় ৭।৮ মাস যাবৎ পেটের অসুখে ভুগিতেছিল, কবিরাজী ও ডাক্তারী অনেক ঔষধ খাইয়াছিল, কোনও ফল পায় নাই, তাহার প্রত্যহ ১০।১২ বার দাস্ত হইত, কিছুই হজম হইত না। এখানে আসিয়া কোন ঔষধ না সেবন করিয়া এবং কেবল নিয়মিত রূপে চলিয়া, ঐ বালক দেড় মাসের মধ্যে বেশ ভাল হইয়াছে, এবং অন্যান্যের মত খাইতেছে ও হজম করিতেছে। মোটের উপর বলি, রোগী বা সুস্থ যে কোন ব্যক্তি এখানে আসিয়া আপন শরীরানুযায়ী নিয়মে যেন সম্পূর্ণ চলেন, পরিমিতাহার করেন, এবং কোন অন্যায় খাওয়ার লোভে না পড়েন।

দ্বিতীয়, উন্মুক্ত সমুদ্র-তীরে ভ্রমণ ও সমুদ্রের বায়ু সেবন।—এ সম্বন্ধে কিছু বলা অতিরিক্ত, কারণ ওয়াল্‌টেয়ারে আসার উদ্দেশ্যই প্রধানতঃ ঐ জন্য। কিছুক্ষণ সমুদ্র-বায়ুতে থাকিলেই শরীরে পরম আরাম হইবে,

বোধ হইবে যেন দেহে বিন্দু বিন্দু শক্তি প্রবেশ করিতেছে। তাহার পর, প্রথম ও সপ্তম প্রবন্ধে সমুদ্র-বায়ুতে অবস্থিত "ওজোন" (Ozone) নামে যে পদার্থের বর্ণনা করিয়াছি, নর-দেহের স্বাস্থ্য-কল্পে তাহা মহোপকারী। ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজাগাপত্তনের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এই উভয় দিকে সমুদ্র। সমুদ্র-জলের উপর প্রবাহিত হইয়া এই দুই দিক দিয়া যে বায়ু আসে, তাহাতে ঐ ওজোন থাকে। আবার এই দুইএর মধ্যে দক্ষিণস্থ সুদূর ভারত মহাসাগর হইতে বিশাল জলরাশির উপর বহিয়া যে বায়ু আসে, তাহাতে অধিক পরিমাণে ওজোন থাকে, এজন্য এ দেশের গ্রীষ্মকাল বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, কারণ ঐ সময়ে "দক্ষিণে হাওয়া" বহিয়া থাকে।

এই ওজোন বায়ু শরীরের বল-কারক ও উত্তেজক। ইহা সেবনে দেহে উল্লাস বোধ হয় এবং ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহা এক প্রকার প্রত্যক্ষ ঔষধ বলিলেই হয়। রোগে উত্থানশক্তি-রহিত ব্যক্তিকে তুলিয়া লইয়া কেবল সমুদ্র তীরে প্রাতে ও অপরাহ্ণে বসাইয়া রাখিলেও অবিলম্বে উপকার দৃষ্ট হয়। যদি কাহারও বেড়াইতে প্রবৃত্তি না হয় বা আলস্য বোধ হয়, তিনি যেন প্রত্যূষে অথবা অপরাহ্ণে সমুদ্র-তীরে দুই ঘণ্টা কাল মাত্র বসিয়া বা শুইয়া থাকেন। দেখিবেন, তাঁহার কাশী বা হাঁপানী রোগ থাকিলে কাশী ও গলার ভার কমিয়া যাইবে, অজীর্ণের জন্য পেট ভার থাকিলে তাহা হাল্কা হইয়া আহারে প্রবৃত্তি জন্মিবে, এবং শরীর অনেকটা ঝর্‌ঝরে হইবে। বোধ হইবে, সমুদ্র-দেব যেন মন্ত্র পড়িয়া ও ফু দিয়া আরাম করিয়া দিলেন। (অর্থাৎ, তরঙ্গ-কল্লোল—সমুদ্রের মন্ত্র, ফু—সমুদ্রের বায়ু।)

বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে বাহিরে থাকিয়া রাত্রি হইয়া গেলেও কোন

ভালই, ব্যায়ামের সহিত বায়ু সেবন হয়। উপরে বলিয়াছি, না বেড়াইতে পারিলে সমুদ্র-তীরে বালুকার উপর বসিয়া থাকিলেও উপকার হয়। বালিতে কাপড় ময়লা হয় না, উঠিয়া ঝাড়িয়া ফেলিলেই হইল, সাহেবদের বালক বালিকা ও রমণীরা তাহাদের মূল্যবান্ পোষাক সমেত সমুদ্র-তীরের বালির উপর বসিয়া ও শুইয়া থাকে।

বেড়াইবার জন্য তীরের উপর উৎকৃষ্ট পাকা রাস্তা আছে, ভিজাগা-পত্তন ও ওয়াল্‌টেয়ারের সমগ্র দৈর্ঘ্য (প্রায় ৪ মাইল) ব্যাপিয়া ঐ রাস্তা। আবার, ভাটায় জল নামিয়া গেলে তীরবর্ত্তী সমুদ্র-গর্ভ হইতে বেশ প্লেন শক্ত ভূমি বাহির হয়, বালুকার মত উহাতে পা বসিয়া যায় না, উহার উপর বেড়াইলে আরও সুখ বোধ হয়। মেমেরা ও সাহেবদের ছেলেরা পায়ের জুতা মোজা খুলিয়া বালির উপর বা সমুদ্র-জলের নিকট বেড়াইতে বড়ই আমোদ বোধ করে; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া তাহাদের পা ভিজাইয়া দেয়, ইহাতেও বেশ সুখ বোধ করে।

সমুদ্র-বায়ুর আরামকারী আর এক গুণ এই যে, উহা নিদ্রা বা তন্দ্রা বৃদ্ধি করে। এই গুণ সম্বন্ধে ইংরাজি পুস্তকে পড়িয়াছি, এবং এখানেও স্বয়ং অনুভব করিয়াছি। আমার দিবা-নিদ্রার অভ্যাস নাই (এবং কলিকাতায় কর্ম্ম-স্থলে তাহা সম্ভবও নহে), কখন পূর্ব্ব রাত্রিতে কোন কারণে জাগরণ হইলেও পর দিন দিবাভাগে নিদ্রা বোধ হয় না। কিন্তু এখানে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে আহারের পর প্রায় প্রত্যহ সমাগত নিদ্রার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে তাড়াইতে হয়।

নবাগত ব্যক্তির নিকট সমুদ্রের গর্জ্জন অর্থাৎ তীরে তরঙ্গ আসিয়া তথায় তাহার পতনের শব্দও অতি বিচিত্র ও কর্ণ-সুখকর বোধ হইবে।

১ম চিত্র।

(৩৬ পৃষ্ঠা।)
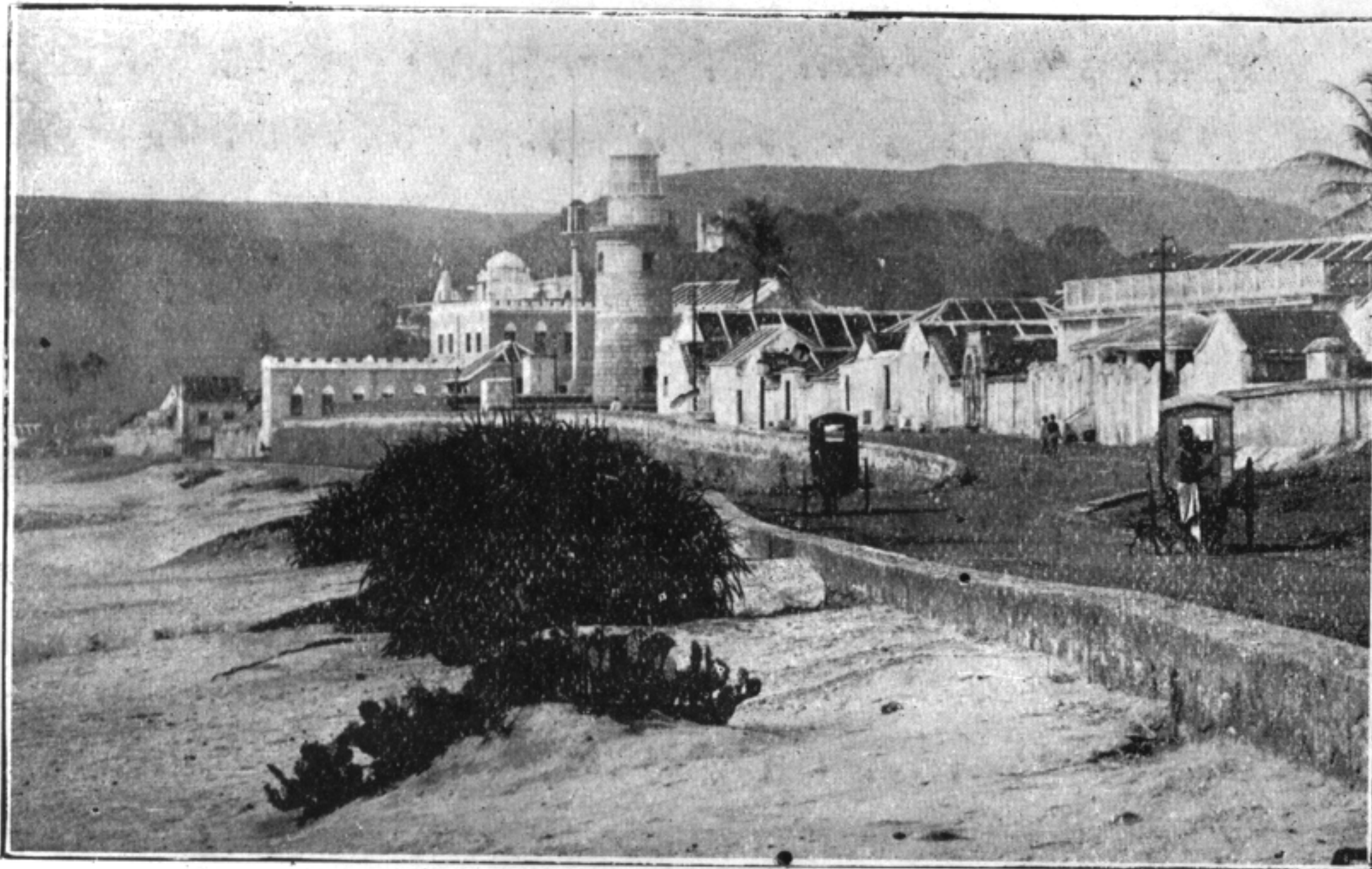
ভিজাগাপত্তনের সমুদ্রতীরস্থ রাস্তার সর্ব্ব-দক্ষিণ অংশ ও লাইট হাউস।

চক্ষু মুদিলে কর্ণে বোধ হইবে, যেন ঝড়ের সহিত মুষল-ধারে বৃষ্টি হইতেছে।

আবার যখন শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নাময় রাত্রে চন্দ্রালোকে সমুদ্রের জল-রাশি যেন রৌপ্যের পাত মোড়া হয়, এবং বিস্তৃত বালুকাময় তীরভূমি সাদা ধব ধব করিতে থাকে, তখনকার সে দৃশ্য কি সুন্দর, এবং সেই সময়ের বায়ু-হিল্লোল কত মিষ্ট লাগে, তাহা বর্ণনা দ্বারা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে না।

কোন বাঙ্গালী তাঁহার পরিবারস্থ রমণীদিগকে লইয়া আসিলে এখানে যেন দেশের মত বন্ধ করিয়া না রাখেন, কারণ তাহা হইলে এখানে আসার অধিকাংশ সুফলই নষ্ট হইবে। এখানে স্বচ্ছন্দে অবাধে বাহিরে বেড়াইতে দিবেন, তাহাতে কোন নিন্দার ভয় নাই, কারণ এদেশে অবরোধ-প্রথা নাই, স্থানীয় ভদ্র ও ধনী সকল রমণীই অবাধে বাড়ীর বাহিরে বেড়াইয়া থাকে। তাহার পর, প্রকৃত পক্ষে যত লজ্জা ত দেশের ও পরিচিত লোকদের সমক্ষে,—এখানে সে আপদ নাই। আর ক্বচিৎ দুই এক জন বাঙ্গালীর সমক্ষে পড়ার জন্য ভয় করিলে চলে না; তবে ততটুকু ভয়েও যাঁহারা কাতর হন, তাঁহারা বাটীর রমণী লইয়া যেন নিজ দেশ হইতে আদৌ বাহির না হন।

তৃতীয়, সমুদ্রে স্নান।—কেবল এক সমুদ্র-জলে স্নানের সুবিধার জন্যই ইয়ুরোপের কত কত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নগরের সাতিশয় আদর ও খ্যাতি দেখা যায়। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে স্নান নর-দেহের পক্ষে নানারূপে মহোপকারী। শরীরে সহ্য হইলেই এখানে সমুদ্রে স্নান করা উচিত। অন্য জলের মত সমুদ্র-জলের স্পর্শে সর্দ্দী হয় না, বরং সর্দ্দী থাকিলে তাহা দূর হয়। এই কারণে অপরাহ্নে সাহেব-শিশুদিগের

দেওয়া হয়। আমার এক আত্মীয়ার কাশ-রোগের জন্য রাত্রে "গলা ডাকিত" ও নিদ্রার ব্যাঘাত হইত, সমুদ্রে স্নান দ্বারা তাহার সেই গলা ডাকা বন্ধ এবং ভাল নিদ্রা হইয়াছিল।

সমুদ্র-জলে স্নানে দেহ-চর্ম্ম উত্তেজিত হয় রক্তের সঞ্চালন বাড়ে, দুর্ব্বল শরীরে ক্রমে বলাধান হয়, এবং শরীর অত্যন্ত "ঝর্ ঝরে" বোধ হয়। সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাত পাইলে ও মস্তকের উপর দিয়া তরঙ্গ যাইলে যে এক প্রকার সুখ বোধ হয়, যাঁহারা সমুদ্রে স্নান করেন নাই, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন না। তাহার পর, সমুদ্রের জলে গাত্র যেন সাবান মাখার মত পরিষ্কার হয়, এবং যাঁহারা তৈল মাখিয়া ভূত সাজেন, অল্প ক্ষণে তাঁহাদের তৈল পরিষ্কার হইয়া যায় ও তাঁহারা পুনরায় মানুষ হন।

সূর্য্যালোক সেবনে জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়, ইহা দেহতত্ত্ব-বিদেরা বলিয়া থাকেন। তৎসহিত সমুদ্র-বায়ু-সেবন ও সমুদ্র-জল সর্ব্বাঙ্গে লাগান হেতুই সকল দেশে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানের বালক-বালিকাদিগকে অত্যন্ত সুস্থ দেখা যায়।

সমুদ্র-স্নানে অন্যান্য উপকারের মধ্যে বহুমূত্র ও glands বা বীচি ফোলা রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বাত-রোগে তরঙ্গের আঘাত ভাল করিয়া লইলে কষ্ট কমিয়া যায়, আরাম বোধ হয়, এবং অনেকের আরোগ্যও হয়। বাত-রোগে বা অন্য কোন পুরাতন রোগে নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলে সমুদ্র জল তুলিয়া গরম করিয়া তাহাতে স্নান করিলে বিলক্ষণ উপকার হয়।

[নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সমুদ্র-জল-স্নানে এত উপকারিতা, সেই স্নান এদেশের লোকেরা পর্ব্ব বিনা অন্য কোন সময়ে করে না।

নবাগত অনেকের পক্ষে সমুদ্রে স্নানে প্রথম প্রথম অত্যন্ত ভয় হইয়া থাকে। অকূল বিশাল সমুদ্র, বড় বড় তরঙ্গ, ও তাহাদের গর্জ্জন, ইহা দেখিয়াই তাঁহারা কাতর হইয়া পড়েন; কিন্তু বাস্তবিক কোন আশঙ্কার কারণ নাই। বরং পুষ্করিণী ও নদীতে স্নানে ভয় থাকিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে নাই। পুষ্করিণী ও নদী স্বভাবতঃ অত্যন্ত ঢালু, যেখানে স্নান করিতেছি, হয় ত তাহার দুই চার পদ অগ্রসর হইলেই একেবারে ডুব-জল। কিন্তু সমুদ্র এত অল্প অল্প করিয়া ঢালু হইয়াছে যে, যেখানে স্নান করিতেছেন, তাহার দশ হাত দূরে যাইলেও তথায় পূর্ব্ব স্থান অপেক্ষা হয়ত দুই চার অঙ্গুলির অধিক জল হইবে না। * যাহা হউক, হাঁটু পরিমাণ জল অপেক্ষা অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। তাহার কম জলেও স্নান হইতে পারে, তবে তথায় ঢেউ লইবার জন্য অত্যন্ত অবনত হইতে হয় বা একেবারে বসিতে হয়। হাঁটু-জলে অবশ্য ডুবিবার কোন আশঙ্কা নাই। তাহার পর, যেমন ঢেউ আসিবে, অমনই তাহার দিকে মুখ করিয়া, যেমন ছাগল বা ভেড়া যেরূপ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে, আপনি সেই ভাবে মস্তক রাখিয়া শরীর অবনত করতঃ দণ্ডায়মান থাকিবেন, তরঙ্গ আপনার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, অত্যন্ত প্রবল হইলে বড় জোরে আপনাকে দুই চারি হাত হঠাইয়া দিবে। সমুদ্র-জলে কখন বসিবেন না, কিম্বা পার্শ্ব করিয়া বা পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইবেন না, কারণ তাহা করিলে আপনি "বেকায়দা" হইবেন এবং

---

* যে সকল স্থানে সমুদ্র-তীর বেশী পরিমাণে ঢালু হইয়াছে, তথায় স্নান করিতে যাইবেন না। সমুদ্র-তরঙ্গের জল তীরে আসিতেছে ও ফিরিতেছে; যে সকল স্থান অধিক ঢালু, তথায় ঐ তরঙ্গ-জলের ফিরিবার সময় এত বেগ হয়, যেন সম্ভাবনা হয় যে স্নানার্থী ব্যক্তিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। অল্প ঢালু স্থানে ঐ আশঙ্কা আদৌ নাই।

তরঙ্গ আপনাকে গড়াগড়ি দেওয়াইবে। অভ্যস্ত হইলে আপনি তরঙ্গের দিকে পশ্চাৎ করিয়াও দাঁড়াইতে পারিবেন। (আর এক কথা, তরঙ্গের সহিত ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কাপড় আঁটিয়া পারিবেন, নতুবা অন্যের সমক্ষে আপনার লজ্জা পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।) এত কথাতেও যাঁহাদের সমুদ্রে নামিবার সাহস হইবে না, তাঁহারা যেন অভাব পক্ষে সমুদ্র হইতে তোলা জলে স্নান করেন।

(সমুদ্রে স্নানের জন্য কম মূল্যের স্বতন্ত্র কাপড় ব্যবহার করিবেন, কারণ লবণ-জলে কাপড় শীঘ্র ক্ষরিয়া ও ছিঁড়িয়া যায়।)

পরিশেষে পুনরায় বলি যে, স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়াছি বলিয়াই যাহা ইচ্ছা খাইব, বা দেশে যাহা সহিত না তাহা করিব, ইহা কখন হইতে পারে না। তাহাতে হিতের পরিবর্ত্তে অহিত হইবে। পূর্ব্বের মত সম্পূর্ণ নিয়মমত চলিতে হইবে, তাহার পর শরীরে ক্রমে বলাধান হইলে ও আনীত রোগের উপশম হইলে, তখন ক্রমে অল্প করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবেন।

আমার শেষ কথা এই যে, এখানে আসিয়া অল্প দিন মধ্যেই কোন উপকার না দেখিলে উতলা হইবেন না। দেশ হইতে আনীত শরীরের দোষ সকল যাইতে অবস্থা-বিশেষে অধিক সময় লাগে। এখানে কিছু দিন বাস দ্বারা সেই দোষগুলি দূর হইয়া যাইলে, তখন এখানকার জল-বায়ুর ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিবেন, অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি ও বল পাইবেন, এবং রক্ত ও মাংস বৃদ্ধিতে দেহের ওজন ক্রমেই বাড়িতে দেখিবেন।

স্থান।

(১)

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ম বা অবস্থিতি প্রবন্ধে এ স্থানের কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছি। তাহা পুনর্ব্বার পড়িয়া তাহার পরে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। কারণ সেই প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার না বলিয়া কেবল অতিরিক্ত বিষয়ই এই প্রবন্ধে বলিব। সুতরাং দুই প্রবন্ধ একযোগে না পড়িলে এস্থান সম্বন্ধে পাঠকের পূর্ণ ধারণা হইবে না।

ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজাগাপত্তন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে ও বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম কূলে অবস্থিত. এবং রেল-পথে কলিকাতা হইতে ৫৪৭ মাইল দূরে। ধনী ও ইংরাজদের বাস হেতু ১৫।২০ বৎসর মাত্র ওয়ালটেয়ারের নাম বাহির হইয়াছে, কিন্তু ভিজাগাপত্তন অতি পুরাতন নগর। ইহার প্রাচীন নাম বিশাখ-পত্তন বা কার্ত্তিকের নগর। স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে, পুরাকালে ভিজাগাপত্তনের দক্ষিণাংশে বিশাখ-দেবের এক পিতল-মণ্ডিত মন্দির ছিল, পরে সমুদ্র তাহা গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ কার্ত্তিক যদি কখনও এখানকার অন্যতম আরাধ্য দেবতা হইতেন, তবে তাঁহার পূজা বরাবর চলিত এবং এ কালেও তাঁহার বিগ্রহ দৃষ্ট হইত। এখানে দুর্গা শিব ও বিষ্ণুর নানা মূর্ত্তির বহু বহু বিগ্রহ ও মন্দির রহিয়াছে, কিন্তু কার্ত্তিকের একটীও নাই।

আবার উপরোক্ত নাম বিশাখ-পত্তনের পরিবর্ত্তে বিশথা-পত্তন ধরিয়া লইলে চলে না কি? এই স্থানে শৈব ও শাক্ত অনেক থাকিলেও বৈষ্ণবদের যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। পরবর্ত্তী ১৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত নিকটস্থ মহাতীর্থ সীমাচল বিষ্ণুর উপাসনায় উৎসৃষ্ট। সেই বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখী বিশথার পত্তন বা আবাস এই স্থানে ছিল, এইরূপ কল্পনা করিয়া ভিজাগাপত্তনের পূর্ব্ব ও শুদ্ধ নাম বিশথা-পত্তন বলিলে মন্দ হয় কি?

যাহা হউক, সেই বিশাখ পত্তন বা বিশথা-পত্তনের অপভ্রংশে এক্ষণে ভিজাগাপত্তন হইয়াছে। স্থানীয় লোকে সংক্ষেপে উহাকে ভাইজাগ বা (ঐ পূর্ণ নামের শেষ অংশ মাত্র ধরিয়া কেবল) পট্টনও বলিয়া থাকে।

মৃত ভারত-দেহের প্রতি শ্বেত শকুনিদের দৃষ্টি পড়িলে ভিজাগা-পত্তন প্রথমে ওলন্দাজদের অর্থাৎ হলাণ্ডবাসীদের ভোগে পড়ে। পরে তাহারা সুমাত্রা দ্বীপ প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া ইংরাজদিগকে ইহা ছাড়িয়া দিয়া যায়। তদবধি ইংরাজদের ভোগে ভিজাগাপত্তন আছে এবং পরে চিরকাল থাকিবে বা কত দিন থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে।

এই স্থানের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ভিজাগাপত্তনের দক্ষিণ হইতে ওয়াল্‌টে-য়ারের উত্তর পর্য্যন্ত প্রায় চার মাইল। সহরের সর্ব্ব-দক্ষিণ হইতে সর্ব্বোত্তর পর্য্যন্ত ব্যাপী দুইটী প্রধান রাস্তা আছে। প্রথম—মধ্যের বড় রাস্তা, দ্বিতীয়—সমুদ্র-তীরবর্ত্তী রাস্তা। এই দুই রাস্তা উভয় দিকে অর্থাৎ উত্তরে ও দক্ষিণে দুই দিকেই পরস্পর মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ মিলিয়া যেন একটা প্রকাণ্ড গোল রাস্তা হইয়াছে। এই সমগ্র গোল রাস্তা প্রদক্ষিণ করিলে,—অর্থাৎ ভিজাগাপত্তনের সর্ব্ব-দক্ষিণ (বা মস্‌জিদের দক্ষিণ) হইতে ছাড়িয়া মধ্যের বড় রাস্তা দিয়া উত্তর মুখে চলিয়া ওয়াল্‌টেয়ার শেষ করিয়া, তথা হইতে পূর্ব্ব দিকে গিয়া কুরুপমের রাজার বাটী ঘুরিয়া সমুদ্র-তীর-

বর্ত্তী রাস্তায় পড়িয়া বরাবর দক্ষিণ মুখে আসিয়া, যেখান (মস্‌জিদ) হইতে প্রথমে ছাড়া হইয়াছিল, সেই খানে পৌঁছিলে—সাড়ে নয় মাইল বেড়ান হয়। অনেক ধনী ইংরাজ গাড়ী চড়িয়া প্রত্যহ এই পথ-চক্র পরিক্রমণ করে। আমি প্রায়ই বাইসিকলে পরিক্রমণ করিতাম; এক দিন পদব্রজে করিয়াছিলাম, তাহাতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

উপরোক্ত দুই প্রধান রাস্তা ব্যতীত অসংখ্য গলি-পথ আছে। কিন্তু তাহাদের সকলগুলি সর্ব্বসময় পরিষ্কার ও দুর্গন্ধ-শূন্য থাকে না। কিন্তু ঐ দুই প্রধান রাস্তা সর্ব্বদা অতি পরিষ্কার রাখা হয় এবং প্রস্তরের উপকরণের গুণে আপনা হইতেই প্রায় সম্পূর্ণ ধূলি-শূন্য থাকে।

মধ্যের বড় রাস্তার উপর যত দোকান ও বাজার প্রভৃতি অবস্থিত, এবং দক্ষিণ ভাগে আদালত, বড় ডাক-ঘর, তার-ঘর, ভিজ্রাগাপত্তন রেল ষ্টেষণ, প্রভৃতি আছে। ভিজ্রাগাপত্তনের প্রায় মধ্য স্থলে "বড়বাজার" অবস্থিত। ইহা কলিকাতার বড়বাজার দূরে থাকুক, অন্য কোনও বাজারের আট ভাগের এক ভাগ হইবে না। এখানে কেবল ফল তরকারি মৎস্য ও মাংস বিক্রয় হয়। কিন্তু ইহার নিকটবর্ত্তী বড় রাস্তার দুই পার্শ্বে উত্তর দক্ষিণে সকল প্রকার দ্রব্যপূর্ণ অনেক ছোট বড় দোকান আছে। এই সমুদয় লইয়া এই বড়বাজার এখানকার সর্ব্বপ্রধান পণ্য স্থান। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র বাজার আছে, তাহাতে প্রধানতঃ মৎস্য বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতীত উত্তর দিকে চাল কড়াই প্রভৃতির মহাজনী গঞ্জ ও হাট আছে। এই গঞ্জ ও হাটকে এখানে সাধারণ লোকে মার্কেট (market) বলে।

মধ্যের বড় রাস্তার সর্ব্ব-দক্ষিণ হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তরে ছত্র। সাধারণতঃ এই ছত্র ভিজ্রাগাপত্তন ও ওয়াল্‌টেয়ারের মধ্য-

ভিজাগাপত্তন এবং ছত্রের উত্তরে শেষ সর্ব্বোত্তর পর্য্যন্ত ওয়ালটেয়ার। এই ছত্রের বিবরণ ৪র্থ বা "উপস্থিতি" প্রবন্ধে (১৩ পৃষ্ঠায়) দিয়াছি। এখানে নবাগত ব্যক্তিদিগের আশ্রয় দানের জন্য ছত্র যে বিশেষ উপকারের বস্তু হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, এবং তজ্জন্য উহার উদ্যোক্তা ও উহা প্রস্তুতের জন্য চাঁদা-দাতারা সর্ব্বসাধারণের প্রশংসার পাত্র। তাঁহাদের নাম ও দানের পরিমাণ ছত্রে মার্ব্বল প্রস্তরে খোদিত আছে।

ভিজাগাপত্তন সমতল সহর হইলেও পাহাড়ের তলদেশ হেতু স্থানে স্থানে উচ্চ নীচ। এই কারণে মধ্যের বড় রাস্তা অনেক স্থানে ক্রম-উচ্চ ও ক্রম-নিম্ন। কিন্তু ছত্রের পর হইতে ঐ রাস্তা উত্তর দিকে ক্রমে কেবল উচ্চ হইয়াছে, এবং প্রায় এক মাইল দূরে (এখানে পথ-পার্শ্বে পাহাড়ের গাত্রে ইংরাজিতে 2 লেখা আছে) সর্ব্বোচ্চ হইয়াছে। এখান হইতে আরও উত্তরে ঐ রাস্তা কোথাও নিম্ন কোথাও কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া মোটের উপর নামিয়া গিয়াছে। এই স্থানে পথের উভয় পার্শ্বের মৃত্তিকা ঠিক সুরকীর মত লাল।

বলা বাহুল্য, রাস্তা যেমন চড়াই হয়, তাহা অতিক্রম করিতে তেমনই পরিশ্রম বা কষ্ট হয়। সাধারণতঃ হাঁটা অপেক্ষা বাইসিকলে চলায় পরিশ্রম কম হয়; কিন্তু এখানে রাস্তা বা কোন কোন স্থান এমন চড়াই যে, তাহাতে হাঁটা অপেক্ষা বাইসিকলে যাওয়া অনেক অধিক কষ্টকর। তথায় বাইসিকল হইতে নামিয়া তাহা হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া পদব্রজে চলায় বরং কম কষ্ট হয়। প্রথম প্রথম এইরূপ কোন কোন পথে আমি বেদম হইয়া বাইসিকল হইতে নামিতে ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইতাম; কিন্তু কিছু দিন বাসের পরে এখানকার সমস্ত চড়াই পথই বাইসিকল হইতে না নামিয়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আবার চড়াই অতিক্রম করিলে এমন ঢালু পথ সকল উপস্থিত হয়, যে তথায় পা না চালাইয়া বাইসিকলে কেবল বসিয়া থাকিলেই তাহা আপনা হইতে মহা বেগে—যথা ঘণ্টায় ১৬ মাইল হইতে ভয়ঙ্কর ২২ মাইল পর্য্যন্ত বেগে—দৌড়ায়। অনুকূল বায়ু পাইয়া এইরূপ ঢালু পথে কয়েক দিন আমার বাইসিকল ঘণ্টায় ২৬ মাইল (২$\frac{২}{৩}$ মিনিটে এক মাইল!) হিসাবে চলিয়াছিল। যাঁহারা বাইসিকলে চড়েন, তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন যে, উহা কি ভীষণ বেগ! কিন্তু এইরূপ বেগেও ভয়ের পরিবর্ত্তে আমার মনে বেশ আনন্দ হইত, এবং কেবল উহারই লোভে প্রত্যহ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চড়াই পথে উঠিতাম। বলা বাহুল্য, পাহাড় হইতে অবতরণের ঢালু পথে বাই-সিকল-আরোহীর ব্রেক ধরিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত নামা উচিত।

কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের সমতল পথাভ্যস্ত ব্যক্তিরা এখানে আসিলে, তাঁহাদিগকে চড়াই রাস্তার আস্বাদ দিবার জন্য আমি নিকটস্থ মহারাণী-পেটা রোডের নাম করিব। ছত্র হইতে কিছু (আনুমানিক দুই শত হস্ত) উত্তরে রাস্তার পূর্ব্ব দিকে মহারাণীপেটা রোডের সাইন-বোর্ড দেখা যাইবে। এই রাস্তা পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া সমুদ্র-তীরে পড়িয়াছে। এই রাস্তা যে সর্ব্বাপেক্ষা চড়াই, তাহা নহে, ইহাপেক্ষা অধিক চড়াই অনেক রাস্তা আছে। তবে চড়াই উঠা নামার দুঃখ ও সুখের আস্বাদ, পদ-ব্রজে ও বাইসিকলে উভয় প্রকার যাত্রীই, এই মহারাণীপেটা রোডে পাইবেন।

অপর প্রধান রাস্তা অর্থাৎ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী রাস্তার ধারে কোন দোকান নাই, তথায় মধ্যে মধ্যে গাড়ী চলিলেও জনতা নাই। প্রাতে

মহামূল্য। এ সম্বন্ধে ৮ম অর্থাৎ "স্বাস্থ্য" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতে বা পুনরায় পড়িতে পাঠককে অনুরোধ করি। এস্থলে আবার স্বতন্ত্র পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

এই রাস্তার সর্ব্ব-দক্ষিণ সীমা ব্যাক ওয়াটার নামে এক বদ্ধ খাল বা অপ্রশস্ত নদী। তথা হইতে কিছু উত্তরে লাইট হাউস (Light House) বা আলোক-স্তম্ভ অবস্থিত। সমস্ত রাত্রি তাহাতে এক বৃহৎ আলোক প্রজ্জলিত রাখা হয়, উহা সমুদ্রের উপর দিয়া গমনকারী জাহাজ সকলের রাত্রিতে পথ-চিহ্নের কার্য্য করে। তীরের রাস্তাতেও বহু দূর হইতে ইহা দেখা যায়, সুতরাং অন্ধকার রাত্রিতে ইহাতে ঐ পথের পথিকদিগেরও সুবিধা হয়। প্রথম চিত্র দেখুন, ইহাতে সমুদ্র-তীরস্থ রাস্তার সর্ব্ব-দক্ষিণ অংশ ও লাইট হাউস আছে। এই স্থানে প্রাচীন কালে এক দুর্গ ছিল, এখন তাহার চিহ্নও নাই।

তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে টাউন হল। ইহা সমুদ্র তীর-বর্ত্তী একটী উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাটী। ওয়াল্‌টেয়ার হইতে ৭০ মাইল দূরস্থ বব্‌লি নামক স্থানের মহারাজোপাধিধারী জমিদার বত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বিতল, উপরের তলায় বক্তৃতার হল, এবং নিম্ন তলায় সংবাদপত্র পড়িবার ঘর, বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘর, প্রভৃতি আছে। যে কোন ব্যক্তি আসিয়া এখানে বসিয়া সংবাদ-পত্র পড়িতে পারেন। অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ইহা খোলা থাকে। আমি থাকিতে শ্রীমতী আনি বেশান্ত এখানে আসিয়া এক দিন এই টাউন হলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এখান হইতে তিন পোয়া মাইল উত্তরে যাইলে রাস্তা হইতে বাম দিকে এক ছোট গলির ভিতর এক শিব-মন্দির দৃষ্ট হইবে। এই মন্দিরের অন্য কোন বিশেষত্ব নাই, তবে যোগ গ্রহণ প্রভৃতির সময়ে এই মন্দিরের

সম্মুখস্থ সমুদ্র-জলে সর্ব্বসাধারণে স্নান করে এবং স্নানান্তে মন্দিরস্থ দেবতাগুলি দর্শন করে।

মন্দিরের সম্মুখে সমুদ্র-তীরে কতকগুলি ক্ষুদ্র পাহাড় বা পাথরের টিপী আছে, উহার উপর বসিয়া অপরাহ্নে বেশ সুখে বায়ু-সেবন করা যায়। এই পাহাড়গুলি তীর হইতে কিছু দূরে সমুদ্র-জলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সুতরাং শেষ পাহাড়ের উপর বসিলে প্রায় সমুদ্রের মধ্যে বসা হয়। তথায় সমুদ্র-তরঙ্গ পাহাড়ে লাগিয়া ছিটাইয়া উঠিতেছে, তাহার কণাযুক্ত বায়ু আসিয়া অঙ্গ শীতল করে। আমি যে দিন দূরে না যাইতে পারিতাম, সেই দিন এইখানে আসিয়া বসিয়া জুড়াইতাম। স্থানীয় হিন্দুদের চক্ষে এই স্থানের এক মাহাত্ম্যও আছে,—কথিত আছে, রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পথে এই পাহাড়ের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

তথা হইতে আরও প্রায় তিন পোয়া মাইল উত্তরে অর্থাৎ এই সমুদ্র তীরবর্ত্তী সমগ্র রাস্তার প্রায় মধ্য স্থলে এক বিশ্রামের স্থান আছে, তাহার নাম Scandal point বা পর-কুৎসা ঘাট। ইহার চার দিকে এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ প্রাচীর এবং ভিতরে চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টকে গাঁথা চার খানা বেঞ্চ আছে। প্রাতে ও অপরাহ্নে অনেকে এখানে আসিয়া বসিয়া বিশ্রাম লাভ ও সমুদ্র-বায়ু সেবন করেন।

যথার্থই এখানে বসিয়া পরকুৎসা করা হইত বলিয়া অথবা অন্য কি কারণে ঐরূপ নাম হইল, তাহা বলা যায় না, তবে ইহার নামানুসারে কার্য্য করিবার স্থান আমাদের বাঙ্গালীর প্রায় ঘরে ঘরেই আছে। তজ্জন্য ইহার নূতনত্ব নাই। আমার এখানে তেমন উপযুক্ত (?) সঙ্গী ছিল না, সেজন্য এই ঘাটে বসিয়াও পরকুৎসারূপ বাঙ্গালীদের পরম প্রিয় পদার্থ আমার ভোগে হয় নাই। [illegible]

আমার সুখই হইয়াছে, কারণ কলিকাতা হইতে কিছু দিনের জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তনের সহিত কর্ণেরও আহার পরিবর্ত্তন হইল।

ইহার পর এই রাস্তা আরও উত্তর দিকে গিয়া ক্রমে পশ্চিমে ঘুরিয়া সহরের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্ব বর্ণিত রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অংশে বিশেষ বর্ণনার কোন দৃশ্য নাই। তবে ইহা বেড়াইবার পক্ষে একটী নির্জ্জন উৎকৃষ্ট পথ।

এই সমুদ্র-তীর-বর্ত্তী পথের ধারে মধ্যে মধ্যে ছোট বড় কয়েকটী বাটী আছে। উহাদের প্রায় সমুদয়ই ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে।

২য় চিত্র।

(৪৯ পৃষ্ঠা।)

সমুদ্রে নৌকা ভাসান হইতেছে।

স্নানের আরও কথা।

(১০)

(সমুদ্র-তীরের এই রাস্তায় দাঁড়াইলে বাঙ্গালীর চক্ষে আর এক বিচিত্র দৃশ্য পতিত হয়—উহা এখানকার জেলেদের মাছ ধরা) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাতে চড়িয়া দাঁড় টানিয়া বা পাল তুলিয়া ধীবরেরা সমুদ্রের উপর নির্ভয়ে বহিয়া যাইতেছে, তরণীগুলি তরঙ্গ-বেগে উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে তরঙ্গের অন্তরালে পড়ায় ও পরে বাহিরে আসায় বোধ হইতেছে যেন সমুদ্র উহাদিগকে গ্রাস করিতেছে ও পরে উদ্গার করিতেছে, কোন কোন নৌকা সমুদ্রের দৃশ্যমান শেষ সীমা—যথায় আকাশের সহিত সমুদ্রের সংযোগ হইয়াছে—কিম্বা তাহা হইতেও দূরে গিয়া একেবারে অদৃশ্য হইতেছে,—এ সকল দৃশ্য বাঙ্গালীর চক্ষে বিস্ময়-জনক ও রোমাঞ্চকর। ২য় চিত্রে এইরূপ এক নৌকা দেখুন। কোন কোন নৌকা অতি প্রত্যুষে বা রাত্রি ৩।৪টার সময় ছাড়ে এবং তীর হইতে ৮।১০ মাইল পর্য্যন্ত দূরে যায়। তাহার পর (নৌকাসকল যখন বহু ঘণ্টার পর ক্রমে ফিরিয়া আসিতে থাকে, এবং জেলেরা আনন্দ-ধ্বনির সহিত ধৃত মৎস্য লইয়া তীরে নামিতে থাকে, তখন—বাঙ্গালী দর্শক—আপনিও মনোভাবের উপরোক্ত উচ্চ স্তর হইতে নিম্নে নামিতে বাধ্য হইবেন, অর্থাৎ প্রকৃতির মহৎ দৃশ্য ছাড়িয়া সাধারণ মানবের মত ধৃত মৎস্য দেখিতে ও তাহা ক্রয় করিতে লোলুপ হইবেন।)

মৎস্য ধরিবার প্রণালী তিন প্রকার। প্রথম, বিশাল জাল। উহার দুই ধারে দুই দীর্ঘ মোটা দড়ি বা কাছি বাঁধা থাকে। জেলেরা ঐ জাল

নৌকায় করিয়া অর্দ্ধ হইতে এক মাইল দূরে ফেলে, তাহার পর দুই দল লোকে তীরে দাঁড়াইয়া দুই ধারের কাচী ধরিয়া জাল টানিয়া তীরের নিকট আনে। ৩য় চিত্র দেখুন। প্রতি ক্ষেপে এক দেড় মণ মাছ পড়ে। কিন্তু এক এক ক্ষেপে প্রায় অর্দ্ধ দিন সময় যায়। দ্বিতীয়, ক্ষুদ্র ও বড় নৌকা করিয়া দূর সমুদ্রে যাইয়া জেলেরা প্রতি নৌকার স্বতন্ত্র জালে মাছ ধরে এবং এক এক বারে ১০।১৫ সের মাছ আনে। তৃতীয়, তীরের নিকট জাল ফেলিয়া ও বর্শি দ্বারা মাছ ধরা। দীর্ঘ সূতায় তিন চারিটী বর্শী গাঁথা থাকে, সূতার অগ্রে একটা ক্ষুদ্র ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া তাহা দূরে জলে নিক্ষেপ করে। প্রতি বর্শীতে টোপ থাকে। সময়ে সময়ে একটী সূতার তিন বর্শীতেই একেবারে তিনটী মাছ পর্য্যন্ত পড়িতে দেখা গিয়াছে।

উপরোক্ত রূপে এই ক্ষুদ্র সহরের পরিমাণে প্রত্যহ রাশি রাশি মৎস্য উঠে। কিন্তু উহার সামান্য পরিমাণ মাত্র বাজারে আসে। জেলেরা বাকি শুষ্ক করিয়া কতক এখানে বিক্রয় করে কিন্তু অধিকাংশ অন্যত্র চালান দেয়।

(সমুদ্র-তীরে আর এক দৃশ্য নবাগত ব্যক্তির নিকট অদ্ভুত বোধ হইবে। উহাকে আমি সমুদ্রে মাণিক জ্বলা বলিব) এই দৃশ্যের জন্য সন্ধ্যার পরে অপেক্ষা করিতে হইবে। কিছু অন্ধকার হইলে দেখিতে পাইবেন, তীরে তরঙ্গ আসিয়া চলিয়া যাইবার পর জ্বলন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু তীরে পড়িয়া রহিয়াছে, বোধ হইবে, কবি-কল্পিত অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার সমুদ্র জ্বলন্ত হীরক-খণ্ড সকল তীরে ছড়াইয়াছে। যেমন উহা দেখিবেন, অমনই শীঘ্র হাতে তুলিয়া লইবেন, নতুবা পরবর্ত্তী তরঙ্গ আসিয়া উহা লইয়া যাইতে পারে। তখন হয়ত সেই কবির কথা মনে হইবে—

৩য় চিত্র।

(৫০ পৃষ্ঠা)

বৃহৎ জালের দুই ধারের দড়ী দুই দল জেলে টানিতেছে।
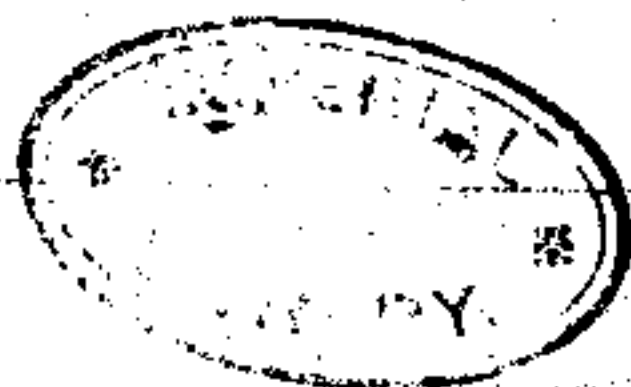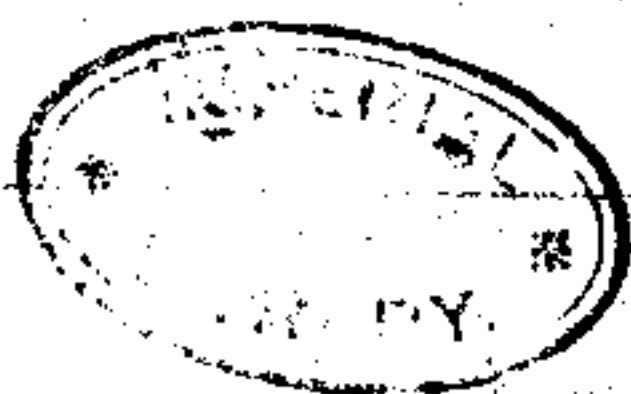
৪র্থ চিত্র।

(৫১ পৃষ্ঠা।)
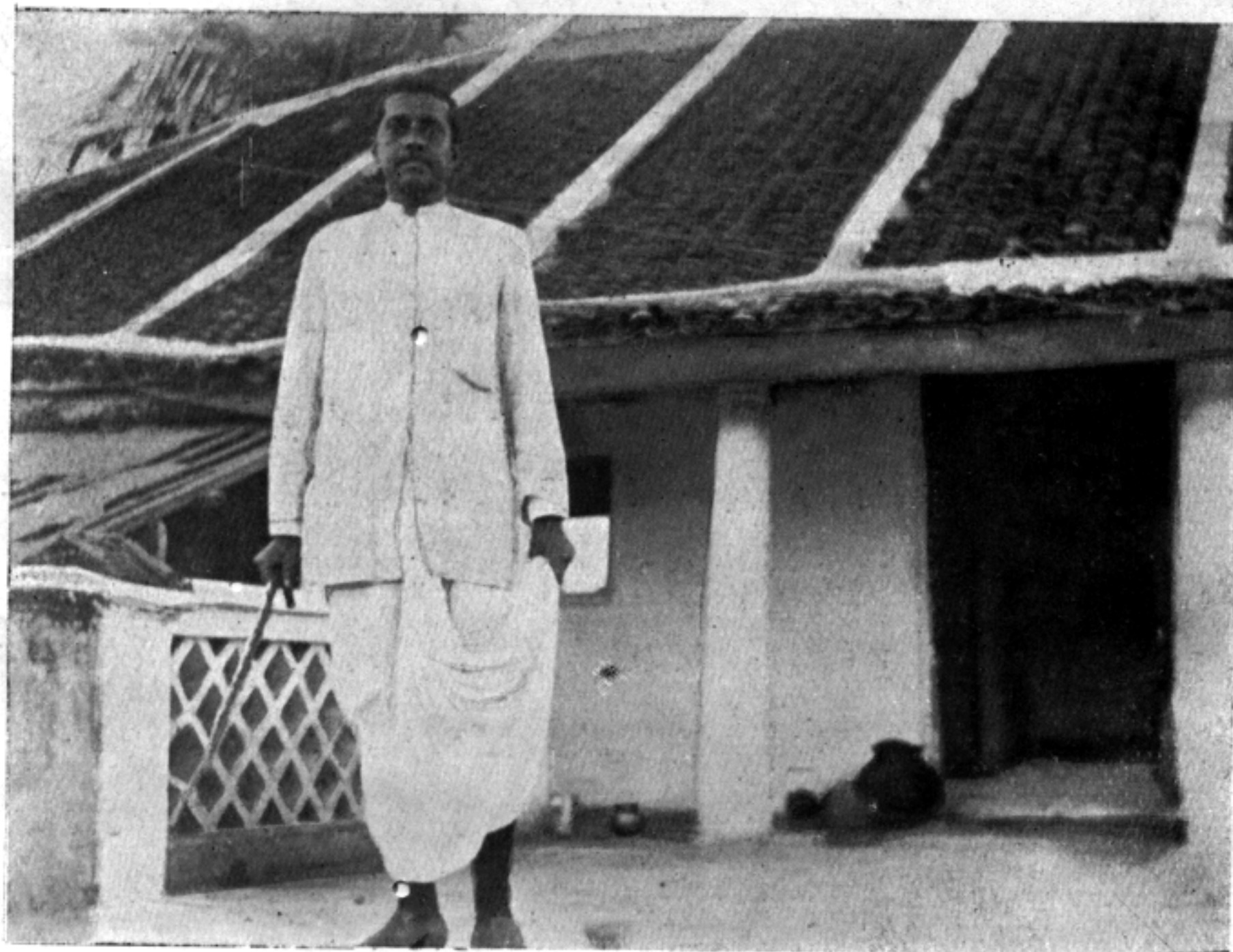
বাটী।

"বড় সাধ করি সাগর সেঁচিনু,
মাণিক পাবারি আশে,
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগী-কপাল-দোষে।"

হাতে উহা তুলিলে জোনাকীর মত আলো দিবে, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে নিবিয়া যাইবে। সমুদ্র-তীরের কোন কোন বালি-কণায় ফস্ফরস থাকে, তরঙ্গ-বেগে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলে বায়ু-সংস্পর্শে তাহা জ্বলিতে থাকে, ইহাই আমার বর্ণিত সমুদ্রে মাণিক জ্বলার মূল তত্ত্ব। এই মাণিক ধরিতে বেশ আমোদ বোধ হইবে।

৫ম বা অবস্থিতি প্রবন্ধে এখানকার বাটীগুলির অবস্থান বর্ণনা করিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি করিব না, কিন্তু সেই অংশ এই প্রবন্ধেরও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পাঠককে তাহা এই স্থলে আর একবার দেখিতে অনুরোধ করি, কেবল সামান্য অবশিষ্ট কথা এখানে বলিব।

অধিকাংশ পাকা বাটীর ছাদ খোলা দ্বারা প্রস্তুত ও ঢালু। তবে তিন চার থাক খোলা সাজান থাকে, তাহা ভেদ করিয়া সূর্য্য-তাপ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। একটী বাটীর চিত্র দিলাম। (৪র্থ চিত্র দেখুন।) ইহা দ্বিতল, সম্মুখে খোলা ছাদ, পশ্চাতে গৃহ। ১ম চিত্রেও এইরূপ বাটী দেখিতে পাইবেন। এখানকার অধিবাসীদিগের নির্ম্মিত সমুদয় বাটীর জানালা অতি ছোট ; ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে—পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—বড় করিলে নাকি লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। আসল কথা, এপ্রদেশে হাওয়ার জোর অধিক, সেই জন্য জানালা ছোট করা হয়। তবে ধনী ও শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বড় বড় জানালা ও খড়খড়ীবিশিষ্ট বাটী করিয়াছেন ও করিতেছেন।

আর এক বিষয়ে বাড়ীগুলি জেনানা-নবিশ বাঙ্গালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—এখানকার সমুদয় বাড়ী এক-মহল রূপে নির্ম্মিত, অর্থাৎ কোন বাড়ীতে স্বতন্ত্র অন্দর মহল নাই, কারণ এখানে অবরোধ প্রথা নাই।

৫ম প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে এ স্থানের উত্তরাংশে অর্থাৎ ওয়াল্‌-টেয়ারে জলের কল নাই, দক্ষিণাংশে অর্থাৎ ভিজাগাপত্তনে আছে। এই জল আট মাইল দূরবর্ত্তী উত্তর দিকস্থ এক পাহাড় হইতে পাইপ-যোগে আসে। * উহা বিশোধিত করা হয় না, অমনই বিতরিত হয়; আর উহা স্বাভাবিকই এত পরিষ্কার যে, তার বিশোধনের প্রয়োজনও হয় না। কোন বাটীতে জলের কল দেওয়া হয় না, পথের কল হইতে জল আনিতে হয়।

উত্তরাংশে ভাল ভাল কূপের জল ব্যবহার হয়। প্রয়োজনীয় জল সংবরাহ জন্য এদেশে এত কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে, যে সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। পথের ধারে, সমুদ্রের তীরে, বালির উপর, যেথানে চক্ষু যায়, সেই খানেই কূপ, এক এক স্থানে দুই তিনটী কূপ নিকটে নিকটে রহিয়াছে; কূপের ছড়াছড়ী। কূপের জল, এমন কি সমুদ্রতীরে বালিতে খোদিত কূপেরও জল, লোণা নহে।

পথে সরকারী বা মিউনিসিপালিটীর কিরসিন ল্যাম্পের দ্বারা আলো-কের বন্দোবস্ত আছে। ওয়াল্‌টেয়ারের সকল স্থানে আলোক নাই, যথায় আছে, তথায়ও অতি দূরে দূরে সন্নিবিষ্ট। ভিজাগাপত্তনে অপেক্ষা-কৃত ঘন ঘন আলোক আছে। কিন্তু সর্ব্বত্র মাসের পনর রাত্রি মাত্র—কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী হইতে শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া পর্য্যন্ত—আলোক জ্বালা হয়, অপর পনর রাত্রি জ্বালা হয় না।

---

* কাহারও কাহারও ধারণা আছে, এই জল সীমাচল পাহাড় হইতে আসে। কিন্তু তাহা নহে।

এই সহর সম্বন্ধে এক প্রশংসার বিষয় আছে। অসচ্চরিত্রা নারীর অভাব না থাকিলেও—কারণ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঐ অভাব অসম্ভব—এখানে কলিকাতা সহরের মত বেশ্যা-পল্লী নাই, এবং মন্দ উদ্দেশ্যে পথে দণ্ডায়মান কোন রমণী আমার কখন চক্ষুগোচর হয় নাই।

বেশ্যার সহচর মদ। উহারও সমান দশা। এখানে কয়েকটী মদের দোকান আছে বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা অতি ক্ষীণ, পথের ধারে থাকিলেও চক্ষে সহজে পড়ে না। দোকানগুলির আকার অতি ক্ষুদ্র, সম্বল যৎসামান্য কয়েকটী মাত্র মদের বোতল, ক্রেতা ক্বচিৎ। কলিকাতার মদের দোকানগুলি সর্ব্বদাই গুলজার, এক একটীই যেন এক এক বাজার। কিন্তু এখানকার মদের দোকান জন-হীন নীরব ক্ষুদ্র ঘর। এখানে মদের নেশা অতি অল্প প্রচলিত, দরিদ্র নেশাখোরেরা অল্প পয়সায় তাড়ী খায়। তাড়ীর আড্ডা অনেক।

দেশী ও ইয়ুরোপীয় অতি অল্পসংখ্যক ডাক্তার এখানে পাওয়া যায়। এই রোগ-হীন স্থানে অধিক ডাক্তারের প্রয়োজনও নাই। দেশীয় চিকিৎসকদের দর্শনী ২৲ ৩৲ ৫৲ ইত্যাদি। হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী প্রণালীর চিকিৎসক আমি দেখিতে পাই নাই।

মুটের মজুরী অল্প, কলিকাতার চারি পয়সার স্থলে এখানে এক বা অত্যধিক দুই পয়সা। তবে রেল ষ্টেষণের মুটেদের কথা স্বতন্ত্র; সকল স্থানেরই ঐ শ্রেণীর মুটেরা অধিক আদায় করিতে চেষ্টা করে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মুটের কার্য্য করিয়া থাকে। স্ত্রী-মুটেরা দুই মণ পর্য্যন্ত বহন করে। কলিকাতার পুরুষ-মুটেরা সাধারণতঃ এক মণের উপর আর পাঁচ সের বহিতে অক্ষম বা অস্বীকৃত হয়।

ধোপা নাপিত অনেক। ধোপাদের মজুরী কলিকাতা অপেক্ষা কম,

শাড়ী সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না, অধিকন্তু শীঘ্র "দিস্তা" পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। ষার্ট বা পিরাণে ঝিনুকের বোতাম আঁটা থাকিলে তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। কারণ ধোপারা পাথরের উপর কাপড় সজোরে আছ্‌ড়ায়। অধিবাসী-পরিমাণে ধোপার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। নাপিতের মজুরী ভিজাগাপত্তনে কলিকাতার মত, অর্থাৎ দাড়ী কামান ও নখ কাটায় অর্দ্ধ আনা, চুল কাটা সহিত হইলে এক আনা, কিন্তু নবাগত ব্যক্তির নিকট উহার দ্বিগুণ আদায়ের চেষ্টা করে। ওয়াল্‌টেয়ারে ঐ দুই কার্য্যের মুল্য দ্বিগুণ—এক আনা ও দুই আনা।

চাকর চাকরাণী যথেষ্ট এবং অনুসন্ধান করিলে হিন্দী জানা ও বাঙ্গালা-জানা লোকও পাওয়া যায়, মাসিক বেতন ৪৲, ৫৲, ৬৲, মাত্র, আর স্বতন্ত্র খাওয়া দিতে হয় না। চেষ্টা করিলে বাঙ্গালা রুচির হিন্দু পাচকও পাওয়া যায়, বেতন ৫৲, ৬৲ মাত্র, খাওয়া দিতে হয় না।

ইদানীং এখানকার ধনী ব্যক্তিরা ফীটন ব্রুহাম ও অন্যান্য প্রকার ভাল ভাল গাড়ী ও তদুপযুক্ত বড় বড় ঘোড়া আনাইয়াছেন। কিন্তু এখানকার ভদ্র লোকদের জন্য সাধারণ চলিত গাড়ী স্বতন্ত্ররূপ। কলিকাতায় বালক-বালিকাদিগকে স্কুলে লইয়া যাইবার জন্য যে ওম্‌নিবস গাড়ী ব্যবহৃত হয়, এখানকার গাড়ী ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ পার্শ্বে দরজা নাই, কেবল পশ্চাতে আছে, তাহা দিয়া নামিতে উঠিতে হয়। কিন্তু এই গাড়ী অতি ক্ষুদ্র, ভিতরে চারি জনের অধিক ধরে না। আর ইহার দুইটী মাত্র চক্র, তাহা গাড়ীর নিম্নে মধ্যস্থলে অবস্থিত। পশ্চাতে সহিসের দাঁড়াইবার স্থান নাই। গাড়ীতে চাকার উপর স্প্রিং এবং ভিতরে বসিবার স্থানে গদি থাকে, সুতরাং আরোহীর কোন কষ্ট হয় না। একটী গরু বা একটী পনি ঘোড়ায় এই গাড়ী টানিয়া থাকে। গরুতে টানা গাড়ীর নাম বাণ্ডী, ঘোড়ায় টানার নাম ঝট্‌কা।

ব্যাণ্ডীগুলি কলিকাতার গরুর গাড়ীর মত নহে, বেশ দ্রুত চলে। এক এক ব্যাণ্ডীর গরু বৃহদাকার ও অনেক সময় ঘোড়ার মত দৌড়াইয়া যায়। কিন্তু মোটের উপর কলিকাতার ভাড়াটিয়া গাড়ী অপেক্ষা আস্তে চলিলেও আমরা (অর্থাৎ নির্ধন ভদ্র পরিবারেরা) কলিকাতায় যদি ব্যাণ্ডী পাইতাম, তবে কত সুবিধাই না বোধ করিতাম, কারণ ভাড়া অতি অল্প, যথা—দুই আনা দিলে এক বা দেড় মাইল যাইতে পারা যায়, প্রতি ঘণ্টার ভাড়া তিন চার আনা মাত্র, দিন ১৲। অধিক দূর বা অধিক সময়ের জন্য হইলে আরও কম পড়ে; যথা— এখান হইতে সীগাচল ১০ মাইল দূরে, তথায় যাইতে ও তথা হইতে ফিরিতে ভাড়া ১।০ বা ১॥০ মাত্র। কত সুলভ দেখুন। ঝট্কার ভাড়া ঘণ্টায় ।৵০—॥০। নিকটবর্ত্তী স্থানে যাওয়া আসা ঝট্কায় শীঘ্র সমাধা হয়। কিন্তু দূর বা উচ্চ চড়াই রাস্তা হইলে ঝট্কাও ব্যাণ্ডীর দশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গরুর অপেক্ষা ঘোড়া অধিক বেগে যাইতে পারে না। গো-বাহন আর এক প্রকার গাড়ী আছে, তাহার ভিতরে ব্যাণ্ডীর মত গদি ও বেঞ্চ নাই, তাহার চালা মেজিয়া এবং উপরে দরমা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত ছাউনী বা আবরণ। ভিতরে দুই জন লম্বালম্বী ভাবে শুইয়া বা চার জন বসিয়া স্বচ্ছন্দে ইহাতে যাইতে পারে। এই গাড়ীর ভাড়া বাণ্ডীর অপেক্ষাও কম।

মটর গাড়ী মটর বাইসিকল ও ট্রাইসিকলেরও আবির্ভাব হইয়াছে, এবং উহা মেরামতের জন্য এখানকার রোম্যান ক্যাথলিক স্কুলের সংযোগে এক দোকান খোলা হইয়াছে, ফ্রান্স দেশ হইতে আগত এক জন পারদর্শী ব্যক্তির উপর ঐ কার্য্যের ভার আছে। এ বিষয়ে ইহার মত দক্ষ লোক কলিকাতা মাদ্রাজ বোম্বাইএও নাই। এখানে বাইসিকল এর ছড়াছড়ী, স্থান-পরিমাণে কলিকাতা অপেক্ষাও অধিক।

দৃশ্য।

(১১)
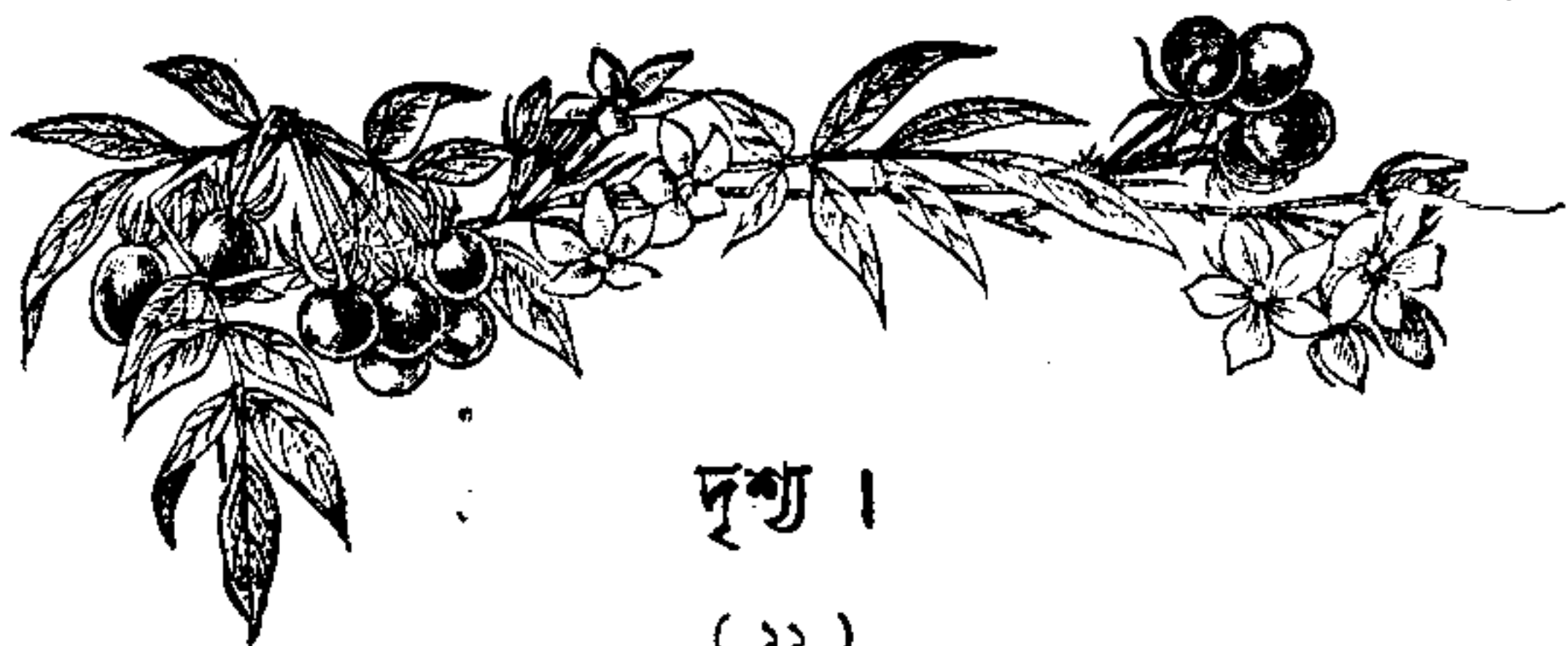
ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য প্রসঙ্গে সমুদ্র-তীর প্রভৃতি এখানকার অনেক দ্রষ্টব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছি। অবশিষ্টগুলির কথা এক্ষণে বলিব।

(এ স্থানের প্রধান সৌন্দর্য্য প্রকৃতি-দত্ত—পূর্ব্ব দিকে বিশাল সমুদ্র, অপর তিন দিকে শৈল-মালা। আবার এ সহর সমতল, অথচ ইহার মধ্যে ও পার্শ্বে পাহাড়। এইরূপ মিশ্র ভাব অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। এখানকার ইহাই এক বিচিত্র ব্যাপার।)

যাঁহারা সমুদ্র হইতে দূর প্রদেশে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে এখানে প্রথম দেখিবার দৃশ্য সূর্য্যোদয় বা প্রাতে সমুদ্রের ভিতর হইতে সূর্য্যের আবির্ভাব। পূর্ব্ব দিকে বিস্তীর্ণ মহা জলরাশির অন্তে, যেখানে নভোমণ্ডলের সহিত সমুদ্রের সংযোগ হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে বোধ হইতেছে যে আকাশ সমুদ্রে ঠেকিয়াছে, কোন মেঘ-শূন্য প্রত্যূষে উঠিয়া সেই দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দেখিবেন—নীল পূর্ব্ব গগনে প্রথমে লোহিত আভার বিকাশ হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পরে জলের উপর উজ্জ্বল লোহিত রেখার আবির্ভাব হইবে, দেখিতে দেখিতে সেই রেখা ক্রমে বাড়িয়া ও শেষে সম্পূর্ণ গোল জলন্ত স্বর্ণের প্রকাণ্ড থালা হইবে—যেন সুবিশাল-কায়া প্রকৃতি সুন্দরীর ললাটে তদুপযুক্ত সুবৃহৎ সিন্দুরের টীপ;—

এ দৃশ্যের—এ প্রাকৃতিক বায়স্কোপের পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যের—সৌন্দর্য্য নিজে না দেখিলে কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না।

রাত্রে সমুদ্র-গর্ভ হইতে চন্দ্রোদয় দৃশ্যও অতি মনোরম। পূর্ণিমা বা কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার রজনীতে চন্দ্রোদয় দেখিতে হইবে। চন্দ্রমণ্ডলের যে এমন লোহিত বর্ণ হইতে পারে, ইহা আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। এখানে সমুদ্র-গর্ভ হইতে চন্দ্র ঠিক সূর্য্যের ন্যায় —তবে অত উজ্জ্বল নহে—পূর্ণ লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া উদিত হয়। উদয় কালে আকারও বড় থাকে। তাহার পর ক্রমে আকাশে যত উঠিতে থাকে, তত আকার ছোট হইতে থাকে, এবং লোহিত বর্ণ ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিদ্রা বর্ণ ও পরিশেষে আরও খানিক উঠিলে শ্বেতবর্ণ হয়।

এইস্থলে একটী মজার কথা কথা বলিব। কথিত আছে, শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্র, ডুম্বুরের ফুল, এবং সর্পের পাঁচ পা, এই তিনের যে কোন একটী কেহ দেখিতে পান, তিনি রাজা হন, অর্থাৎ এই তিনটী দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। প্রথমটীর সম্বন্ধে বলি—শুক্ল দ্বিতীয়ার সূক্ষ্ম চন্দ্র-রেখা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতিপদের রেখা আরও কত সূক্ষ্ম হইতে পারে; তাহার পর প্রতিপদে সূর্য্যের অতি নিকটে চন্দ্র থাকে, সুতরাং সূর্য্যাস্তের পরে আকাশে উহা এত অল্পক্ষণ থাকে, যে তাহাতে উহা দেখিবার অবসরই হইতে পারে না। উহা ছাড়া সেই সময়ে অস্তমিত সূর্য্যের উজ্জ্বল জ্যোতি আকাশে থাকে, তাহার মধ্যে প্রতিপদের চন্দ্র-রেখা চক্ষে দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। ইহা বুঝিয়াও রহস্যের ছলে আমার স্ত্রী শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্র দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, দেখিবার সুবিধার জন্য উচ্চ গিরি-শিখরে চড়িয়াছিল। ফল যাহা হইবার, তাহা হইল। আমি বলিলাম, রাজ-রাণী এ জন্মে বা পর জন্মে ত হইতে

পারিলে না, দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখ যাহা দেখিতে পাইবে, এ জন্মে এই দরিদ্রের গৃহিণী হইয়াছে, কিন্তু ঐ চন্দ্র দেখিলে পর জন্মে রাজ-রাণী না হইলেও অন্য এক প্রকার রাণী (চাকরাণী) হইবে, আবার তৃতীয়ার চন্দ্র দেখিলে আরও এক উচ্চ স্তরের রাণী হইবে, পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

ভিজাগাপত্তনে অনেক দেব-মন্দির আছে। মন্দিরগুলি সুদৃশ্য এবং প্রায় সকলেরই গাত্রে ও চূড়ায় নানা মূর্ত্তি ও ফুল পাতা প্রভৃতি গঠিত। (৫ম চিত্রে ভিজাগাপত্তনের বাজারের সম্মুখস্থ দুর্গা-মন্দির দেখুন।) সকল দেব-বিগ্রহই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা শিব-লিঙ্গ, বিষ্ণু, বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, মহিষাসুর-বিনাশোদ্যতা দুর্গা, ইত্যাদি। কয়েক দুর্গা-প্রতিমার বাঙ্গালা দেশের অপেক্ষা বৃহৎ ও ভীষণ আকার, লোহিত বর্ণ, ও গলদেশে কালীর মত নৃমুণ্ডমালা। মন্দির-গুলি সকল সময় খোলা থাকে না, তবে কোন ভদ্র লোক অনুরোধ করিলে অসময়েও খুলিয়া দেখান হয়। দেব-বিগ্রহের সম্মুখে দেয় লইয়া কোন পীড়াপীড়ী নাই, এক পয়সা দিলেও চলিতে পারে, তবে ভদ্র লোকের পক্ষে অত কম দেওয়া ভাল দেখায় না।

ওয়াল্‌টেয়ারের উত্তরাংশে অব্‌জর্ভেটরীর কিছু উত্তরে, পথের পার্শ্বে এক অদ্ভুত দেব-মন্দির আছে, উহা অন্যত্রের হিন্দুর পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। মন্দিরটী কারুকার্য্য-শূন্য ক্ষুদ্র একটী পাকা ঘর মাত্র, তাহার ভিতর তিনটি বিগ্রহ আছে, তাহা দেখিলেই বোধ হয় যেন বুদ্ধ দেবের তিনটী মূর্ত্তি। ইহাদের নাম পলামা, নীলামা, ও কুঞ্চমা। ইহারা এদেশের আদিম দেবতা, অথবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের, কিম্বা জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার অনু-করণ বা নামান্তর, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না, কারণ পুজকের কথা বুঝিতে পারি নাই। তবে দেখিয়াছি, একই গঠন হইলেও একটী

৫ম চিত্র।

(৫৮ পৃষ্ঠা।)

দুর্গামন্দির।
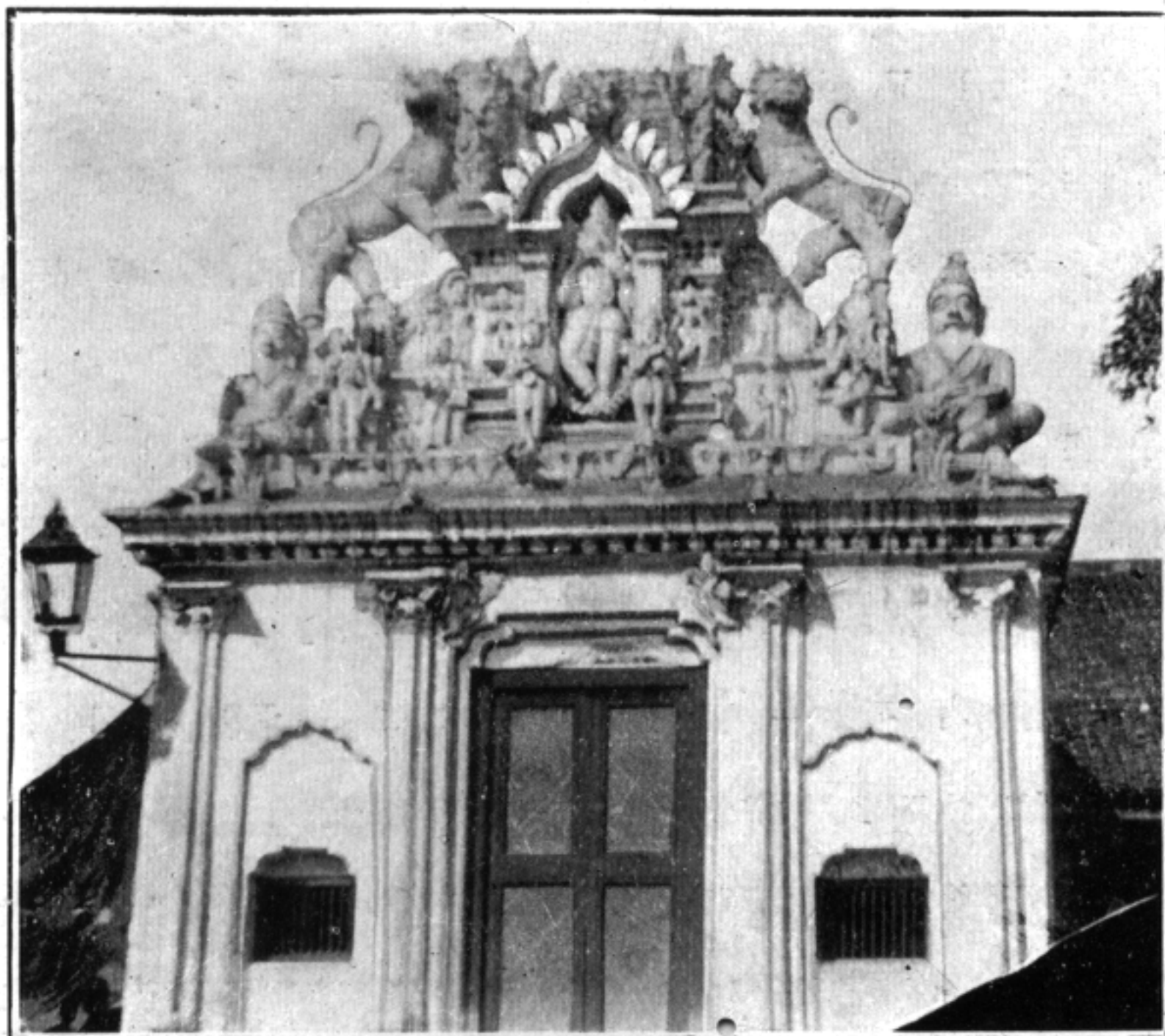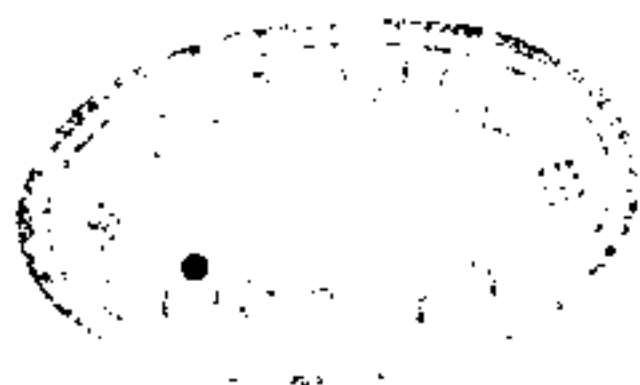
বিগ্রহকে স্ত্রী-মূর্ত্তির মত কাপড় পরান হইয়াছে। সপ্তাহে এক দিন মাত্র—কেবল মঙ্গলবার—এই মন্দির খোলা ও পূজা হয়, এবং বিচিত্রতা এই যে, এখানে হাড়িকাটে কুক্কুট বলি হয়। দেবতার প্রসাদ করা হইলে যাঁহাদের ঐ মাংস খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহারা প্রতি মঙ্গলবার দুই এক পয়সা এখানে দিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন।

এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে কুরূপমের রাজবাটীস্থ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ভিজাগাপত্তন হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানের নাম কুরূপম্, তাহার জমিদার বা রাজা তাঁহার মৃত স্ত্রীর স্মরণার্থ তাঁহার ওয়াল্‌টেয়ারস্থ বাটীতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ওয়াল্‌টেয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এই বাটী অবস্থিত। ভিজাগাপত্তন হইতে তথায় যাইতে হইলে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী রাস্তা সহজ পথ। সহরের মধ্যবর্ত্তী বড় রাস্তা দিয়াও যাওয়া যায়, কিন্তু সে পথ দীর্ঘ ও উচ্চ-নিম্ন। রাজ-বাটীর চতুর্দ্দিকে সুন্দর উদ্যান। উদ্যানের ফটক পার হইয়া অল্প দূর যাইলে এক প্রাচীরের বেষ্টন দৃষ্ট হইবে। তাহার ভিতর ঐ মন্দির অবস্থিত। সেই বেষ্টনের ভিতর প্রবেশ করিলেই বোধ হইবে, মহিষী মমতাজ মহলের শোকে অধীর মোগল বাদশাহ সাহজেহান খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যে অদ্ভুত স্মৃতি-মন্দির—তাজমহল—সৃষ্টি করিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীতে এখানেও স্ত্রীর শোকে তাহার অনুরূপ—অবশ্য অতি ক্ষুদ্র অনুরূপ—করা হইয়াছে। আমি মাঘ মাসের প্রথমে এ স্থান দেখিলাম, এ সময়ে সমুদয় পুষ্প-বৃক্ষ কুসুমে পরিপূর্ণ। অন্য সময়ে এরূপ থাকে কিনা বলিতে পারি না। প্রাচীর-বেষ্টনের ভিতরে প্রবেশ করিবা মাত্র আমার বোধ হইল যেন উপন্যাসে বর্ণিত কোন পরী-স্থানে আসিয়াছি। উদ্যানটী এত পরিষ্কৃত ও এমন বিচিত্র ভাবে সাজান এবং নানা বর্ণের পুষ্প এত অজস্র ফুটিয়া

রহিয়াছে, যে বোধ হইল যেন ইহা কোন প্রকাণ্ড রঙ্গালয়ের এক বিশাল দৃশ্যপট, মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং কোন দক্ষ চিত্রকর তুলি দ্বারা বহু বর্ষের পরিশ্রমে তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। এই স্থানের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধির জন্য উপরে মনোহর কুঞ্জ, ও মৃত্তিকা-নিম্নে দেহ শীতলকারী গুহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সুদৃশ্য দুষ্প্রাপ্য অনেক বৃক্ষও দেখিলাম, যথা ওয়াটার-পাম (Water Palm) বা জলবৃক্ষ, কৃত্রিম ফোয়ারার মত দেখিতে এক প্রকার ঝাউ, বিচিত্র বিবিধ ফরণ (Fern) বা পত্রের শোভাবিশিষ্ট পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ, অর্কিড বা আকাশ-কুসুম, ইত্যাদি।

তাহার পর মন্দিরের কথা। ভুবনেশ্বর বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে প্রাচীন হিন্দু ভাস্করদের কীর্ত্তি দেখিয়া সকলেই প্রীত ও আশ্চর্য্য হন। আমার ধারণা ছিল, এক্ষণে ভারতের প্রাচীন গৌরব লোপের সহিত সম্ভবতঃ তৎসময়ের সেই কলা-কুশল ভাস্করকুলেরও লোপ হইয়াছে। কিন্তু এই মন্দির দর্শনে আমার সেই ধারণা দূর হইয়াছে, এবং সেইরূপ ভাস্কর আজও ভারতে বিদ্যমান আছে জানিয়া মহা আনন্দ লাভ করিয়াছি। মন্দিরটী তত বৃহৎ নহে। ইহা প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরে উপর হইতে সর্ব্ব নিম্ন পর্য্যন্ত খুদিয়া এরূপ সুন্দর নানা বিচিত্র কারুকার্য্য করা হইয়াছে যে, তাহা কেবল দেখাই কর্ত্তব্য, বর্ণনায় কোন ফল নাই। স্তম্ভগুলির কারুকার্য্যও অতি সুন্দর। তদ্ব্যতীত মন্দির-গাত্রে দশ অবতার ও অন্যান্য মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে খোদিত আছে। অবতার-গুলির কল্পনাতেও কবিত্ব আছে, যথা মৎস্য অবতারের মূর্ত্তির নিম্নার্দ্ধ মৎস্য, উপরার্দ্ধ মানবী, চারিটী শিশু তাহার স্তন পান করিতেছে। পুরাণে বর্ণিত আছে, বিষ্ণু মৎস্যাবতার হইয়া চারি বেদ রক্ষা করেন, সেই চারি বেদ এই শিশুরূপে কল্পিত হইয়াছে।

মন্দিরাভ্যন্তরে পুরুষের প্রবেশানুমতি নাই, কেবল রমণীরাই যাইতে পারেন, মন্দির-রক্ষককে অনুরোধ করিলে তিনি রমণীদের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেন। আমার সহধর্ম্মিণীর মুখে শুনিলাম, অভ্যন্তর ঝাড় লণ্ঠনাদি দ্বারা সুশোভিত, তথায় মৃতা রাণীর শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তর নির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি, এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনেকগুলি ফটোগ্রাফ আছে। মূর্ত্তির সম্মুখে দিবারাত্র আলোক প্রজ্জ্বলিত থাকে এবং পুষ্প ধূপ প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধ করা হয়। রাণীর সিন্দুর এক কৌটায় রক্ষিত আছে, সমাগতা সধবা ভদ্র রমণীদের কপালে তাহা দেওয়া হয়। মন্দির-রক্ষককে কিছু দেওয়া রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ।

রাজার পত্নীর নাম ছিল লক্ষ্মী, ইং ১৮৯৪ সালে বিবাহ হয়, ১৯০১ সালে দুই পুত্র এক কন্যা রাখিয়া রাণী স্বর্গতা হন। ইনি শিক্ষিতা পতিব্রতা ধার্ম্মিকা ও দয়াবতী নারী ছিলেন। মন্দিরের বহির্গাত্রের চতুর্দ্দিকে, তেলগু ও ইংরাজি ভাষায়, ইহাঁর জীবনী, শোকাতুর স্বামীর শোক-গাথা, ভগবদ্গীতার কবিতা ও শোকপূর্ণ নানা শ্লোকমালা, কৃষ্ণ ও শ্বেত প্রস্তরফলকে খোদিত আছে। ইংরাজি সমুদয় লেখা আমি পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, কেবল দুই একটীর ভাব মাত্র বলিব—"এই স্থানে আমার প্রিয়া লক্ষ্মীর দেহ সমাহিত আছে, এই স্থানে আমার অন্তরও সমাহিত আছে," "বসন্তের প্রারম্ভে গোলাপ প্রস্ফুটিত না হইতে কোরকাবস্থাতেই ছিন্ন হইল," "পৃথিবীতে একটী দেবী (Angel) কমিয়া গেল, স্বর্গে একটী বাড়িল," "পৃথিবী ক্ষণিক স্বপ্নমাত্র," ইত্যাদি ইত্যাদি। একাধারে বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও গভীর শোক-কাহিনী-পূর্ণ এই স্থান দর্শনে মনে বিষাদ-মিশ্র আনন্দ ভাবের উদয় হয়।

সীতারাম বাবাজীর পাহাড় ও খৃষ্টান শৈল।

(১২)

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজাগাপত্তনের এক দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র, অপর তিন দিকে পাহাড়। এই পাহাড়গুলি কোথাও বিচ্ছিন্ন ভাবে কোথাও বা যুক্ত দীর্ঘ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দূর হইতে উহাদিগকে সামান্য উচ্চ বলিয়া বোধ হয়; মনে হয় কোনটী মাটীর ঢিপী, কোনটী বা কলিকাতার দুই তিন বা চার তলা বাটীর সমান উচ্চ, এবং যেন অতি নিকটে, এক বা দুই মাইল মাত্র ব্যবধানে রহিয়াছে। আরও বোধ হয়, পাহাড়ের গাত্র যেন সুন্দর শ্যামল তৃণে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মে আবরিত। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা করিবেন, অর্থাৎ কোন পাহাড়ের নিকটে গিয়া তাহার শিরোদেশে আরোহণের চেষ্টা করিবেন, তখন সেই যে এক হিন্দী প্রবাদ বাক্য আছে—"ছিট (ছিট কাপড়) বেশ্যা ও পাহাড়, এই তিনের দূর হইতেই বাহার", —তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। যে পাহাড় দুই মাইল দূরে মনে করিয়াছিলেন, হয়ত দশ মাইল চলিয়া চলিয়াও তাহার পথ ফুরাইতেছে না; পাহাড়ের গাত্রে যাহা শ্যামল তৃণ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ বোধ করিয়া-

ছিলেন, পাহাড়ের তলদেশে গিয়া দেখিবেন, তাহা তাল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; যে পাহাড় চার তলা বাটীর সমান উচ্চ মনে করিয়াছিলেন, বহুক্ষণ যাবৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া উঠিয়া তাহার শিরোদেশে পৌঁছিয়া জানিতে পারিবেন যে সেই পাহাড় সম্ভবতঃ ৫০০ ফুট বা চলিত ৫০ তলা বাটীর ন্যায় উচ্চ।

কিন্তু পাহাড় দর্শন ও তাহাতে আরোহণ এরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য হইলেও উৎসাহী ব্যক্তির উহাতে বেশ আনন্দ বোধ হয়। তদ্ব্যতীত পাহাড় আরোহণে যথেষ্ট শারীরিক উপকারও হয়, যথা মাংসপেশী দৃঢ়, ফুস্‌ফুস সবল, শরীর লঘু বোধ, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি, ইত্যাদি হয়। কিন্তু কেবল পাহাড়ে উঠিবার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এই সহরের বাহিরে দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, সহরেই যথেষ্ট পাহাড় আছে।

কবি-কল্পিত দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারা ছিন্ন-পক্ষ মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায়, সীতারাম বাবাজীর পাহাড়, সহরের মধ্যে, যেন হস্তদ্বয় দক্ষিণে লম্বিত ভাবে রাখিয়া ও পদদ্বয় উত্তর দিকে ছড়াইয়া, শুইয়া রহিয়াছে। হস্তদ্বয়ের শেষ ভাগে, অর্থাৎ পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগের উপত্যকায়, হিন্দু কলেজ, সিভিল হস্পিট্যাল প্রভৃতি অবস্থিত। এই নিম্ন উপত্যকাপ্রদেশও এত উচ্চ যে, তদুপরিস্থ ঐ হিন্দু কলেজ ও হস্পিট্যাল বাটী সহরের দক্ষিণে প্রায় সর্ব্বত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ৯ম বা "স্থান" প্রবন্ধে যে মহারাণীপেটা রোডের কথা বলিয়াছি, তাহা পাহাড়ের পদদ্বয়ের উপর দিয়া অর্থাৎ উত্তর ভাগের তলদেশ দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে সমুদ্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের পশ্চিম ভাগের অনেক স্থান সহরের মধ্যবর্ত্তী বড় রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং পাহাড়ের পূর্ব্বভাগ ঢালু হইয়া পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাস্তার উপর গিয়া পড়িয়াছে।

সহরের মধ্যবর্ত্তী বড় রাস্তা হইতে পূর্ব্বাভিমুখীন এক গলির ভিতর এই পাহাড়ে উঠিবার সোপান আছে। "সীতারাম বাবাজীর পাহাড়" এই বলিলেই যে কোন গাড়োয়ান বা পথের লোক ঐ গলি দেখাইয়া দিবে। সোপানগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত কিন্তু এক্ষণে ভগ্ন দশায় আছে। ১১১টী সোপান চড়িলে এক পাতার ঘর দৃষ্ট হইবে, তথায় সীতারাম বাবাজীর লোক বাস করে। তাহার উপর আর সোপান নাই। তথা হইতে আরও অনেকটা চড়াই পথে উপরে উঠিলে শিরোদেশে পৌঁছান যায়। তথায় একটী মন্দিরের কিয়দংশ মাত্র নির্ম্মিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, সীতারাম বাবাজী—যাঁহার নামে এই পাহাড়ের নাম—এক জন সাধু পুরুষ; তিনি দরিদ্র, সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ঐ মন্দির নির্ম্মাণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। মন্দিরে সত্যনারায়ণের মূর্ত্তি থাকিবে। এই পাহাড়ের সমস্ত অংশ বালুকাময় অথচ তাহারই উপর অসংখ্য তাল গাছ আছে এবং এক্ষণে আম, আতা, পেয়ারা প্রভৃতির গাছ রোপণ করা হইয়াছে। নিম্ন হইতে অত উচ্চে জল বহিয়া উহাদের পোষণ ও রক্ষা করা হয়। পাহাড়ের পূর্ব্ব ভাগের নিম্ন অংশ জেলেদের কুটিরে সমাচ্ছন্ন।

অধিকতর দ্রষ্টব্য সহরের দক্ষিণের তিনটী পাহাড়; উহাদের একটীর উপর গির্জ্জা, একটীর উপর মস্‌জিদ, ও একটীর উপর হিন্দু মন্দির আছে। দূর হইতে বোধ হয় যেন এক পাহাড়েরই উপর ঐ তিনটী অবস্থিত। এই স্থলে নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, কতকগুলি অলস লেখক ও ভ্রমণকারী—পাহাড়গুলির উপরে উঠা দূরে থাকুক—নিকটে যাইবার কষ্ট পর্য্যন্ত স্বীকার না করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এক পাহাড়েই ঐ তিনটি অবস্থিত এবং তদুপরি কবিত্ব ফলাইয়া লিখিয়াছেন, এক স্থানে এই তিন ধর্ম্মের এরূপ অপূর্ব্ব একত্র মিলন রূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কোথাও নাই।

৬ষ্ঠ চিত্র।

(৬৫ পৃষ্ঠা।)
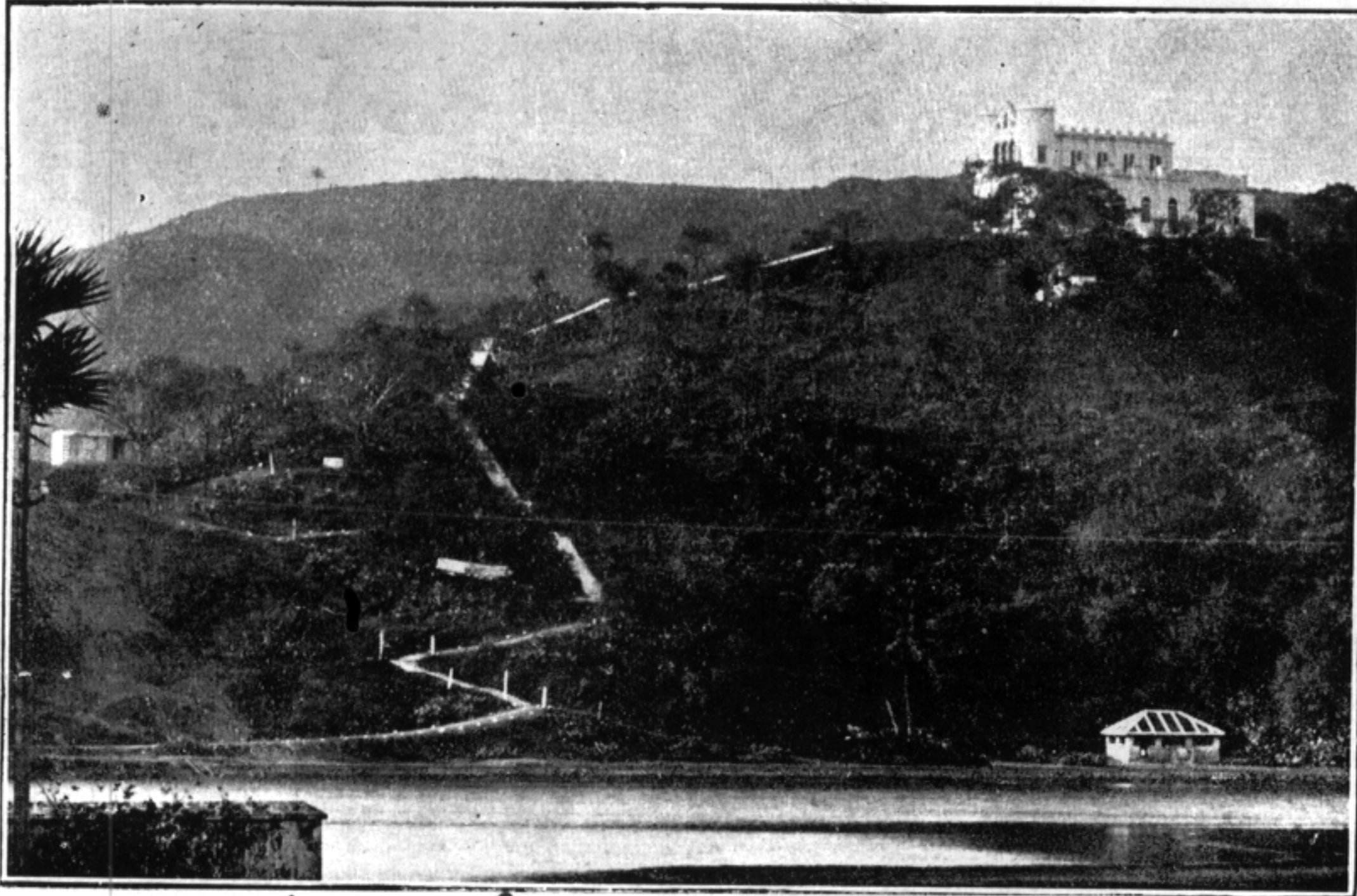
খ্রীষ্টান পাহাড়ে উঠিবার পথ ও উপরে গির্জ্জা।

এই তিন পাহাড়ের মধ্যে পশ্চিমটী সর্ব্বোচ্চ, ইহার নাম রসের পাহাড় (Ross's Hill) এবং ইহার উপর খ্রীষ্টানদের গির্জ্জা। ৬ষ্ঠ চিত্র দেখুন। এই গির্জ্জা বহু মাইল দূর হইতে দেখা যায়। উপরে পৌঁছিতে ২৩২টী সিঁড়ী উঠিতে হয়। সিঁড়ীগুলি ক্রম, অল্প অল্প উচ্চ, সুতরাং উঠিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। মধ্য পথে ক্লান্ত আরোহীর বিশ্রামের জন্য বসিবার স্থান আছে। যাঁহারা সিঁড়ী দ্বারা উঠিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা এক স্বতন্ত্র ঢালু পথ দিয়া উঠিতে পারেন।

এই গির্জ্জা রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের। উপরে পৌঁছিলে প্রথমে সম্মুখে গির্জ্জার চূড়া-দেশে সন্তান (যিশু) ক্রোড়ে মেরীর গঠিত মূর্ত্তি চক্ষুতে পড়িবে। গির্জ্জা প্রায় বন্ধ থাকে, নিকটে মালী বা রক্ষকের ঘর আছে। তথা হইতে ডাকিলে সে গির্জ্জা খুলিয়া দিবে; সে হিন্দী ও ইংরাজি বুঝে না, তবে আকারে ইঙ্গিতে উদ্দেশ্য বুঝিবে। প্রায়ই গির্জ্জার ভিতর এক জন শ্বেতাঙ্গকে গভীর ধ্যানে মগ্ন দেখা যায়, সময়ে সময়ে তাহার চক্ষুদ্বয় বস্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, একারণে মালী নিঃশব্দে প্রবেশ করিতে বলিবে।

ভিতরে বেদীর উপর পূর্ণ মনুষ্যাকারের মেরীর দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে, ক্রোড়ে শিশু যিশু। এই মূর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে গঠিত, যথাযথ বর্ণে রঞ্জিত, অতীব সুন্দর। দুই পার্শ্বে করজোড়ে দুই পরী বসিয়া রহিয়াছে, সম্মুখ ভাগ আলোক প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত। বোধ হয় যেন বঙ্গীয় কোন হিন্দু প্রতিমা সম্মুখে রহিয়াছে। উপরে ছাদের নিকট ক্রুশে বিদ্ধ বিশু খ্রীষ্টের পূর্ণ মনুষ্যাকার মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার এরূপ উৎকৃষ্ট গঠন যে, দেখিলে বোধ হয় যেন যিশু সদ্য হত হইয়াছেন এবং তাঁহার পেরেক-বিদ্ধ দেহ হইতে টাট্‌কা রক্ত পড়িতেছে। অপর তিন দিকে প্রাচীর-গাত্রে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় নানা চিত্র আছে।

অতঃপর গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ গিয়া কয়েক সিঁড়ী নিম্নে নামিলে এক প্রাঙ্গণ বা উঠান দৃষ্ট হইবে। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক গুহার ভিতর একটী সুসজ্জিত মেরীর মূর্ত্তি আছে, হস্তে মালা, যেন তিনি মালা জপিতেছেন; সম্মুখে কৃত্রিম পুষ্পের বিচিত্র শোভা। এই গুহার দ্বারও বন্ধ থাকে, মালীকে বলিলে খুলিয়া দিবে। এই মূর্ত্তিটীও অতি মনোহর। গির্জ্জার ভিতরের ও বাহিরের এই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া, খ্রীষ্ট-ভক্তের কথা বলি না, অভক্তও মোহিত হইবেন। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত একটী জলাশয় বা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, ইহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত থাকে।

এই সকল দেখাইবার নিমিত্ত মালীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দেওয়া উচিত, এক আনা বা অত্যধিক দুই আনা পাইলেই সে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইবে।

এই শৈল-শিখর হইতে সমগ্র ভিজাগাপত্তনের সুন্দর পূর্ণ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৭ম চিত্র।

(৬৭ পৃষ্ঠা।)
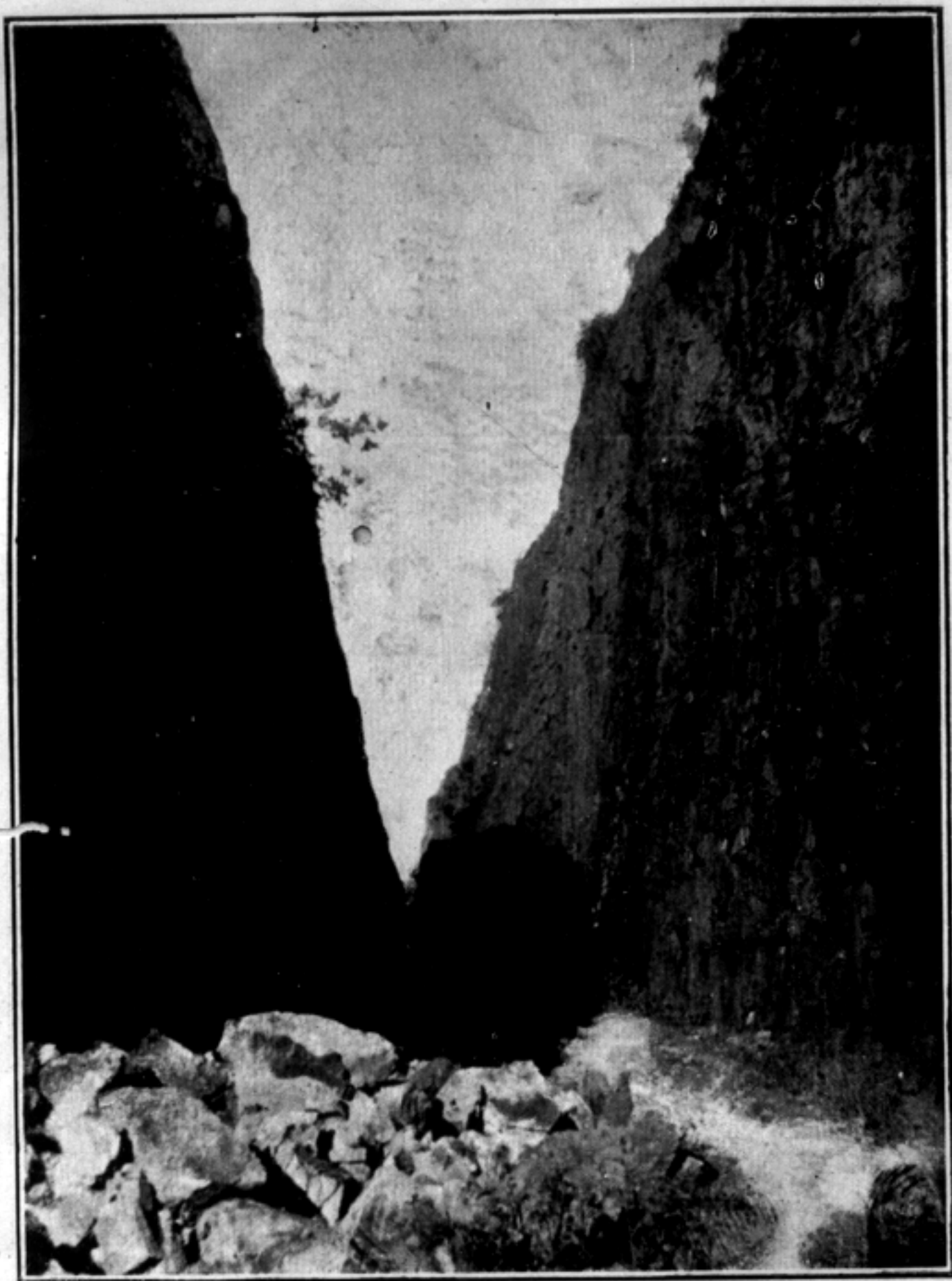
মস্‌জিদ ও গির্জ্জার পাহাড়ের মধ্যপথ।

মুশলমান ও হিন্দু পাহাড়।

(১৩)

গির্জ্জার পাহাড়ের ঠিক পূর্ব্বে মস্‌জিদের পাহাড়। এই দুই পাহাড় পূর্ব্বে এক ছিল, পরে কাটিয়া—উপর হইতে তল-দেশ পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলায়—স্বতন্ত্র দুই পাহাড় ও মধ্যে পথ হইয়াছে। দুই পার্শ্বে সরল উচ্চ ভাবে দণ্ডায়মান দুই পাহাড়ের মধ্যের এই সংকীর্ণ কাটা পথটী দেখিবার বস্তু; উহার ভিতরে যাইলে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খাইবার পাশ নামক গিরি-সঙ্কট কিরূপ ভীষণ স্থান—যাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনেক বৃহৎ সেনাদল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে—তাহার আভাস পাওয়া যায়। ৭ম চিত্র দেখুন। দুর্ভাগ্যক্রমে স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য এই পথের স্থানে স্থানে বড়ই দুর্গন্ধ। আর মস্‌জিদের পাহাড়ে যাইবার ইহা রাস্তাও নহে।

সহরের পাহাড়গুলির মধ্যে মস্‌জিদের পাহাড় সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ। অতি নিকটে পাহাড়ের আস্বাদ লইতে হইলে ইহাতে উঠিতে হয়। ইহা গির্জ্জার পাহাড় অপেক্ষা উচ্চে অনেক কম। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী রাস্তার প্রায় সর্ব্ব-দক্ষিণে যাইলে এই পাহাড়ের তলস্থ মস্‌জিদের তোরণ বা ফটক দৃষ্ট হয়। এই তোরণ জনৈক স্থানীয় হিন্দু জমিদার—ইহাঁর নাম যজ্ঞরাও—টাকা দিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য মস্‌জিদ-রক্ষক মুশলমান তাঁহাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিল। তোরণ হইতে ১১৪ সিঁড়ী

উপরে এক মুশলমান ধার্ম্মিকের কবর ও দরগা। ইহাঁর নাম সৈয়দ আলী মদিন আউলিয়া। ইনি এক্ষণে পীররূপে প্রত্যহ পূজিত হন। কবরের উপর আরবী অক্ষরে ইহাঁর জন্মের তারিখ প্রভৃতি লিখিত আছে। দরগার ভিতরে আলোক দেওয়া ও ধূপ ধূনা জ্বালা প্রভৃতি হয়, এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পয়সা লওয়া হয়। দরগার প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটী কবর আছে। এখান হইতে ৫১ সিঁড়ী উপরে মস্জিদ। এত উপরে উঠিবার কষ্টের জন্য বা অন্য কি কারণে বলিতে পারি না, ইদ বক্রীদ প্রভৃতি পর্ব্ব ব্যতীত অন্য কোন সময়ে স্থানীয় মুশলমানেরা এখানে উপাসনার্থ আসেন না। কেবল মহরমের কয় দিন এই পাহাড় স্থানীয় হিন্দু মুসলমানে পূর্ণ হয়। মহরম এখানকার ঐ উভয় জাতির পর্ব্ব। ২০ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা করিব।

সর্ব্বনিম্নের সোপান হইতে চূড়ার মস্জিদ পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ এক্ষণে অতি ভগ্ন ও শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে। মস্জিদ-রক্ষক মুশলমানকে এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে ব্যক্তি দুঃখের সহিত বলিল, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে হাইদরাবাদের জনৈক ভূতপূর্ব্ব নিজাম বা অধিপতি এই দরগার জন্য বার্ষিক ত্রিশ টাকা আয়ের ও মস্জিদের জন্য ত্রিশ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি দান করেন। সুদীর্ঘ কালক্রমে সেই দুই আয়ের এক্ষণে এক এক শত গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ মস্জিদ ও দরগার উভয়ের আয় এক্ষণে বার্ষিক ছয় সহস্র টাকা হইয়াছে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, এবং সেই জন্য এই দুরবস্থা হইয়াছে। এই আয়ের অভাবে, এই স্থানের বর্ত্তমান সত্বাধিকারীর এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, মস্জিদ সংস্কার দূরে থাকুক, স্বীয় পরিবার ভরণ-পোষণের জন্য তিনি আপন আস্‌বাব পোষাকাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন। আর এই স্থানে কোন ধনী মুশলমানও নাই

৮ম চিত্র।

(৬৯ পৃষ্ঠা।)

হিন্দু পাহাড়ের উপরিস্থ মহাবিষ্ণু মন্দির।

যে, এই স্বধর্ম্মীয় কীর্ত্তি রক্ষার জন্য অর্থ-সাহায্য করেন। মস্‌জিদ-রক্ষক ভদ্র ও নম্র-স্বভাব কিন্তু অতি দরিদ্র, উঁহাকে দুই চার আনা দিয়া বিদায় লইতে হয়।

এই পাহাড়ের উপর হইতে সমগ্র ভিজাগাপত্তনের পূর্ণ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মুশলমান পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণে হিন্দু পাহাড়। মস্‌জিদের তোরণের বাহির হইয়া পশ্চিম মুখের এক গলির ভিতর কিছু দূর যাইলে হিন্দু পাহাড়ে উঠিবার সোপান-শ্রেণী ও উপরে মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের দ্বার সকল সময় খোলা থাকে না। নিম্ন হইতে ঐ দ্বার দেখা যায়। যদি দেখেন দ্বার বন্ধ, তবে সেই গলিতে আরও কিঞ্চিৎ পশ্চিমে যাইলে দেখিবেন, বাম পার্শ্বস্থ এক বাটী হইতে উপরের মন্দির পর্য্যন্ত এক দড়ী লাগান আছে, সেই দড়ী ধরিয়া টানিলে মন্দিরের এক ঘণ্টা বাজিতে থাকে। মন্দিরাধ্যক্ষ ঐ বাটীতে বাস করেন। তিনি সেই শব্দ শুনিয়া এক গুপ্ত পথ দ্বারা উপরে উঠিয়া পশ্চাদ্দিকস্থ এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন, এবং তাহার পরে সাধারণের জন্য প্রকাশ্য দ্বার খুলিয়া দেন।

সহরস্থ সমুদয় পাহাড়ের মধ্যে এই হিন্দু পাহাড় সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। ইহার নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত সিঁড়ীর সংখ্যা ৬৭ মাত্র, কিন্তু "ধাপ"গুলি উচ্চ উচ্চ। মন্দিরের চার দিকে প্রাচীরের বেষ্টন। মন্দিরটী ছোট, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু এবং তৎসহিত তাঁহার পত্নীরূপে মহালক্ষ্মী ভূদেবী ও শ্রিদেবী এই তিন নামের তিনটী মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের নাম বিষ্ণু-মন্দির বা মহাবিষ্ণু-মন্দির। ৮ম চিত্র দেখুন। পূজক ও সত্বাধিকারী অতি ভদ্র লোক, ইনি হিন্দী ও ইংরাজীতে কথা কহিতে পারেন।

প্রতি বৎসরের সঞ্চিত টাকা নির্দ্দিষ্ট দিনে দরিদ্রভোজনাদিতে ব্যয় করেন। নিজে চিকিৎসকতা জানেন এবং তাহার আয়ে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

এই মন্দিরে টাকা দিলে যে কোন দিন ভোগ পাওয়া যায়। উহা উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের ও সাক্ষীগোপালের মন্দিরের ভোগের মত অখাদ্য নহে, এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভোগের মত দুষ্পাচ্য নহে, তদ্বিপরীতে সুখাদ্য ও সুপাচ্য। সমুদয়ই অন্নের ভোগ, চাল ঘৃত ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। চারি প্রকারের ভোগ হয়। (১) চক্রপঙ্গল, ইহা মিষ্ট, কতকটা সীতাভোগের মত; (২) পুলিহারা, ইহা ঝাল মশালা দ্বারা প্রস্তুত, এক প্রকার নিরামিষ পোলাও বলিলে চলে; (৩) দধ্যোজনম, ইহা দধিমিশ্রিত অন্নভোগ; এবং (৪) বাঙ্গালী বাত, ইহা জাফ্‌রাণ প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত ও বাঙ্গালীদের রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত ভোগ। প্রতি প্রকার ভোগের মূল্য ১৲, অর্দ্ধ ভোগ পাওয়া যায় না। প্রতি ভোগে এক সের চাল লাগে, সুতরাং উহা চার হইতে ছয় জনের আহারের পক্ষে যথেষ্ট।

উপরোক্ত হিন্দু পাহাড় ব্যতীত, আর একটী হিন্দু পাহাড় আছে। ইহার নাম ব্যাঙ্কটেশ্বর পাহাড়। ইহা ভিজাগাপত্তন সহরের উত্তর দিকে, ছত্র হইতে ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেষণে যাইবার পথের পার্শ্বে অবস্থিত। এই পাহাড় অতি অল্প উচ্চ, এবং ইহার উপরে এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু, নাম বা উপাধি ব্যাঙ্কটেশ্বর মহাবিষ্ণু। মন্দিরের ক্ষুদ্র আকারের উপযুক্ত উহার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র দর-দালান আছে, এবং কাশী প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের অনুকরণে, উহাতে দুইটী ক্ষুদ্র ঘন্টা যাত্রীদের বাজাইবার জন্য ঝোলান আছে।

বাঙ্কটেশ্বর পাহাড়ের তিন স্থানে প্রস্তরের উপর পদ-চিহ্ন খোদিত আছে; ভক্তেরা বলিয়া থাকেন, উহা বিষ্ণুর পদ-চিহ্ন, অর্থাৎ এই মহা

পবিত্র পাহাড়ে এক সময়ে দেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং বিষ্ণু বিচরণ করিয়াছেন। কিন্তু পদ-চিহ্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের, সুতরাং এক ব্যক্তি বা এক দেবতার কিরূপে সম্ভবে? আমি বলি, ভক্তেরা এ বৈসাদৃশ্যের সম্বন্ধে সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা বলিবেন, অনিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্য বা আটটী অসাধারণ ক্ষমতা থাকা দেবতার লক্ষণ, সেই ক্ষমতা-বলে বিষ্ণুদেব যে নিজ ইচ্ছা মত এই পাহাড়ের তিন স্থানে তিন আকারের দেহ গ্রহণ করিয়া তিন আকারের পদ চিহ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পাহাড়ে প্রথমে উঠিতেই দুইটী বৃহৎ পদ-চিহ্ণ চক্ষে পড়িবে, উহার একটী খারাপ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের দর-দালানের বাহিরে ও উত্তরে আর এক যোড়া পদ-চিহ্ণ আছে, ইহা অন্য দুই স্থানের অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং সাধারণ মনুষ্যের পদের মত ইহাদের আকার। মন্দির ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইলে এক ঢালু প্রস্তর-খণ্ডের উপর একটী মাত্র পদ-চিহ্ণ দেখা যাইবে। ইহার আকার অতি বৃহৎ। যদি দশ হাত দীর্ঘ মনুষ্য হয়, তবে তাহার পদ-চিহ্ণ এই আকারের হইতে পারে। উভয় পদের না থাকিয়া কেবল এক পদের চিহ্ণ রহিল কেন, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে এখানকার রসিক যুবকেরা উত্তর দিল যে, এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে এই খানে বিষ্ণু দেব যেমন এক পা ফেলিয়াছিলেন, অমনই পিছ লাইয়া নিম্নে পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই উভয় পদের চিহ্ণ এখানে হয় নাই। কিন্তু তাহার পর কি হইল, কি করিয়া দেবতা উঠিলেন, তাঁহার আঘাত লাগিয়াছিল কি না, এবং তজ্জন্য তিনি কি এই স্থানের উপর রাগ করিয়াছিলেন, ইহার কোনও সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

প্রতি বৎসরের ২রা মাঘ এই স্থানে বহু জন-সমাগম হয়। পরবর্ত্তী ২০ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা দেখিবেন।

ডল্‌ফিন্স নোজ এবং ভ্যালি গার্ডেন।

(১৪)

ভিজাগাপত্তনের দক্ষিণ সীমা এক খাড়ী বা ক্ষুদ্র নদী। ইহাকে ব্যাক ওয়াটার বলে। ইহা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সহরের ভিতরে গিয়াছে এবং ক্রমে অগভীর হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া এক বৃহৎ জলায় পরিণত হইয়াছে। এই ব্যাক ওয়াটারের তীর ভিজাগাপত্তনের বন্দর। তীরে কষ্টম্‌স্‌ অফিস বা পরমিট ঘর। তথায় ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেষণ হইতে এক শাখা রেল আসিয়াছে। তীর হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে সমুদয় ষ্টীমর আসিয়া লাগে, জল কম হেতু আর নিকটে আসিতে পারে না। নৌকা দ্বারা ষ্টীমরে যাওয়া আসা করিতে হয়। রেল হইবার পূর্ব্বে ষ্টীমর দ্বারা লোকের ওয়াল্‌টেয়ারে যাতায়াত করিতে হইত। এক্ষণে কেবল মাল আমদানী রপ্তানী এবং এখান হইতে রেঙ্গুণে শ্রমজীবী বা কুলী মজুর প্রভৃতির বহন কার্য্যে ষ্টীমরগুলি নিযুক্ত।

এখানকার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)। ব্যাক ওয়াটারের ধারে ইহা সতত স্তূপাকারে থাকে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় পাথরিয়া কয়লার পাঁজা রহিয়াছে, কিন্তু নিকটে গিয়া হস্তে তুলিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা অত্যন্ত ভারী, সুতরাং পাথরিয়া কয়লা হইতে পারে না। ম্যাঙ্গানিজ এক প্রকার মিশ্র খনিজ পদার্থ, ইহা হইতে বা ইহার সংযোগে ইস্পাত হয়। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে ইহার খনি আছে। ইহা এত পাওয়া যায় ও এত বিদেশে রপ্তানি হয় যে,

কেবল ইহা বহন করিবার জন্যই উপরিকথিত শাখা রেল প্রস্তুত হইয়াছে, এবং জাহাজে লইয়া যাইবার জন্য বহু নৌকা সমস্ত দিবা নিযুক্ত থাকে। অপর রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে দেখিলাম গুড়, এক প্রকার নিকৃষ্ট গুড়। এই স্থানের প্রয়োজনের পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানী মালও আসে, তাহার অধিকাংশ কেসে বা কাষ্ঠের বাক্সে প্যাক করা বিলাতী দ্রব্য।

সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলেও ব্যাক ওয়াটারে কোন তরঙ্গ নাই, নির্ভয়ে অপর পারে যাওয়া যায়। খেয়া নৌকা আছে, তাহা সমস্ত দিন লোক পারাপার করে। এক ব্যক্তি এই কার্য্য জমা লইয়াছে। পার হইবার নির্দ্দিষ্ট মূল্য এক পাই, পর পারে যাওয়া ও তথা হইতে ফেরা এই উভয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট দুই পাই। উহা ব্যতীত আমি দাঁড়ী মাঝিদিগকে সন্তোষস্বরূপ আরও কিছু দিতাম, কারণ তাহারা আমাদিগকে অত্যন্ত যত্ন ও সম্মান করিত। পর পারে যাইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিতে হয়, কারণ তাহার পর ঐ নৌকা থাকে না এবং অন্য কোনরূপে পার হইবার সুবিধা নাই।

অপর পারে দেখিবার দুইটী বস্তু আছে—ডল্‌ফিন্স নোজ ও ভ্যালি গার্ডেন। প্রথমটীর জন্য পার হইবার পর ব্যাক ওয়াটারের ধার দিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতে হয় এবং দ্বিতীয়টীর জন্য পশ্চিম দিকে যাইতে হয়।

ডল্‌ফিন্স নোজের অর্থ ডল্‌ফিন নামক তিমি জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের নাসিকা। এখানে উহা এক উচ্চ পাহাড়, তীর হইতে দীর্ঘাকারে বহু দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, সম্ভবতঃ এই কারণে ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। উপরে উঠিবার নিমিত্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত পথ আছে, উহা অতি মন্দ ও ভগ্ন, অনভ্যস্ত বাঙ্গালীদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর; কিন্তু মনে উৎসাহ থাকিলে উহা দ্বারাও এই শৈলে চড়িলে আনন্দ বোধ হয়। আর এখানে সমাজস্থ

প্রায় সকল বাঙ্গালীই এই শৈল দেখিবার জন্য ঐ পথ-কষ্ট সন্তোষের সহিত সহ্য করেন।

ডল্‌ফিন্স নোজের উপর প্রথম দেখিবার বস্তু এক ভগ্ন অট্টালিকা। দূর হইতে বোধ হয় যেন উহা সমুদ্রের ২০।৩০ হস্ত মাত্র উপরে অবস্থিত, কিন্তু উহার দিকে ক্রমোচ্চ পথে উঠিতে উঠিতে বুঝিতে পারিবেন, কত উচ্চে ঐ বাটী রহিয়াছে। তবে এখানে যে কোন ব্যক্তি বিশেষ ক্লেশ বিনা আসিতে পারেন। আমি হাঁপানী-রোগী, আমারই ঐ পর্য্যন্ত উঠিতে ৬ মিনিট মাত্র সময় লাগিয়াছিল, আর এক দিন সঙ্গিনী দুই রমণীর জন্য ৮ মিনিট লাগিয়াছিল। আমার সহিত অন্য এক দিন জনৈক যক্ষ্মারোগী ভদ্র যুবক উঠিয়াছিলেন, তাঁহারও ৮॥ মিনিট মাত্র লাগিয়াছিল। নিম্নে বহু দূর হইতে এই বাটী দেখা যায় এবং অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইলে দেখিবেন, উহা এক কালে বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। এক্ষণে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এবং একটী ঘর ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্রের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। সমাগত দর্শক-দের লিখিত নাম ও অন্য নানা কথায় ভিতরের সমস্ত দেওয়ালের গাত্র পরিপূর্ণ। বাটীর চতুর্দ্দিকে আম কাঁঠাল ও নানা পুষ্পবৃক্ষ প্রভৃতির বৃহৎ উদ্যান, জলাধার, পাহাড় হইতে জল আসিবার নালী, কূপ, প্রভৃতি কত কি আছে। এই পার্ব্বত্য স্থানে ঐরূপ অত ব্যাপার করিতে কত টাকাই না লাগিয়াছিল, প্রস্তোতা কিরূপ সৌখীন ব্যক্তিই না ছিলেন। সমুদ্রের দিকে ও অন্যান্য দিকে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর করিতেই নিশ্চয় বহু সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এক্ষণে সমুদয় স্থান জঙ্গল ও সর্পের আবাস হইয়াছে। শুনিলাম, ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে, এক জন ইংরাজ এই উদ্যান-বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আনুমানিক বিশ বৎসর হইল তিনি বিলাতে যাইয়া তথায় মারা পড়িলে তাঁহার পত্নী এ দেশে

আসিয়া ঐ বাটী বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ক্রেতা না পাওয়ায় অবশেষে জনৈক ধনী এদেশীয়ের নিকট অত বড় সম্পত্তি নয় শত টাকা মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এইরূপ দূর স্থানে উপযুক্ত ভাড়াটিয়া পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া ক্রেতাও এই বাটী ফেলিয়া রাখিয়াছেন, ইহার দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না, এবং তাহাতেই ক্রমে এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। কিছুকাল পরে হয়ত ইষ্টকস্তূপ ব্যতীত আর কোন চিহ্ন থাকিবে না। যিনি এই উদ্যান-বাটিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার কত সখের জিনিষই না উহা ছিল এবং তাহার এক্ষণে কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে!

সমুদ্র ও তদুপরিস্থ জাহাজ, জাহাজে যে সকল নৌকা মাল লইয়া যাইতেছে, তাহাদের নাবিকেরা কিরূপ সাহসিকতার সহিত ও দৃঢ়রূপে হাল দাঁড় ধরিয়া বহিয়া যাইতেছে, নৌকাগুলি তরঙ্গ-বেগে মধ্যে মধ্যে কিরূপ উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সময়ে সময়ে হয়ত কোন বৃহৎ তরঙ্গের জল নৌকার উপর পড়িয়া নাবিকদিগকে ভিজাইয়া দিতেছে, এই সকল এখান হইতে অতি সুন্দর দেখা যায়।

এই সকল দর্শনের পর পুনরায় রাস্তা ধরিয়া উপরে উঠিতে হয়। ভগ্ন বাটীর নিম্নের রাস্তার পরিমাণ অপেক্ষা তাহার উপরের রাস্তার অর্থাৎ ভগ্ন বাটী হইতে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত রাস্তার পরিমাণ তিন গুণের অধিক। রাস্তা মন্দ এবং স্থানে স্থানে অত্যন্ত চড়াই। উৎসাহী ব্যক্তিরা কিন্তু তাহাতে কাতর হন না। এই পথ অতিক্রম করিয়া চূড়া পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আমার ২১॥ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। আর একবার এই পাহাড়ের সমস্ত পথ চলিতে, অর্থাৎ পাহাড়ের তলদেশ হইতে, ভগ্ন বাটীকে পার্শ্বে রাখিয়া, একেবারে চূড়ায় উঠিতে আমার

রমণী, মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে, ঐ সমস্ত পথ ৪৪ মিনিটে উঠিয়াছিলেন, এবং ২১ মিনিটে নামিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, যে কোন উৎসাহী ও অদুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে এই শৈলোপরি আরোহণ দুরূহ নহে।

ব্যাক ওয়াটারের পার-ঘাট হইতে ভগ্ন বাটী পর্য্যন্ত পথ সিকি মাইল ও চলিতে ৬-৮ মিনিট, এবং তথা হইতে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত পথ তিন পোয়া মাইল ও চলিতে ২২-২৫ মিনিট, অর্থাৎ সমুদ্র হইতে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ পথ এক মাইল ও তাহা চলিতে ২৮-৩৩ মিনিট লাগে। উঠিবার সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অর্থাৎ হাঁফাইতে হাঁফাইতে ও প্রকৃতই 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে ফেলিতে' উঠিতে হয়। নামিবার সময় ঐ কষ্ট নাই, কিন্তু অতি সাবধানে নিম্ন দিকে দেখিয়া দেখিয়া নামিতে হয়, নতুবা পা পিছলাইয়া বা পাথরে ঠক্কর পাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

শিখর দেশে একটী উচ্চ নিশানের কাষ্ঠ-স্তম্ভ আছে। উহার চার দিক বেষ্টন পূর্ব্বক এক গোলাকার চাতাল বা মেজিয়া আছে। এই চাতালের চার দিকে গোল সিঁড়ী কাটা। তাহা দিয়া উঠিয়া চাতালের উপর উপ-বেশন করিলে অত কষ্টের পর কি সুখই না বোধ হয়! পর্ব্বতারোহণের গুরু পরিশ্রম তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যায় এবং মৃদু শীতল সুমিষ্ট বায়ুতে শরীর জুড়াইয়া যেন নিদ্রা আসে, সেখান হইতে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না। তাহার পর চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া পথ-শ্রম সার্থক হয়। বহু নিম্নে এক কোণে ভিজাগাপত্তন সহর যেন কৃষ্ণনগরের প্রস্তুত খেলানার বাটী ও গ্রামের ন্যায় এবং মনুষ্যগুলি চলন্ত অতি ক্ষুদ্র পুতুলের ন্যায় লক্ষিত হয়। তিন দিকে অপ্রতিরুদ্ধ বিশাল সমুদ্র, তন্মধ্যে উত্তর দিকে লসন্ বে (Lawson's Bay) নামক এক ক্ষুদ্র উপসাগর। পশ্চাতে পাহাড় ও তাহার নিম্নে এরাডা নামক এক বৃহৎ গ্রাম। এই শিখর প্রদেশ

বোধ হয় সমুদ্র-জল হইতে চার শত ফুট (বাঙ্গালা দেশের বাটী হিসাবে ৪০ তলা) উচ্চ হইবে। ভিজাগাপত্তনের সর্ব্বোচ্চ পাহাড় যে খ্রীষ্টান শৈল, তাহাও এখানে বহু নিম্নে দেখায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত উচ্চ স্থানেও আম তাল প্রভৃতি বৃক্ষ অজস্র রহিয়াছে ও ফল প্রসব করিতেছে। পথে অনেকগুলি ভগ্ন বাটী ও নিকটে পরিত্যক্ত পুরাতন কামান দেখিয়া বোধ হয় এক সময়ে এখানে কেল্লা বা সৈনিক নিবাস ছিল।

ডল্‌ফিন্স নোজ শৈলের পাদ-দেশের অপর দিকস্থ উপরোক্ত এরাডা গ্রামের দরিদ্র রমণীরা প্রত্যহ এই পাহাড় উল্লঙ্ঘন করিয়া এবং ব্যাক ওয়াটার নদী পার হইয়া তরিতরকারী জ্বালানী কাষ্ঠ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ ভিজাগাপত্তনে আসে। আবার বিক্রয়ের পর সেই দিনই পুনরায় ঐ দুরূহ প্রক্রিয়ায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। মস্তকে বৃহৎ মোট লইয়াও বালিকা যুবতী বা বৃদ্ধা কেহই কষ্ট বোধ করে না। যত কষ্ট আমাদের অর্থাৎ অক্ষম বাঙ্গালীদের ; আমাদের মধ্যে অনেকের আপন দেহ বহন করিতেও কষ্ট বোধ হয়।

এই সকল দর্শনের পর ডল্‌ফিন্স নোজ হইতে নামিবেন। উপরে বলিয়াছি নামিতে কষ্ট নাই। তাহার পর সমুদ্রতীরস্থ পথ দ্বারা পশ্চিম মুখে যাইলে, অর্থাৎ ব্যাক ওয়াটার পার হইয়া যেখানে উঠিয়াছিলেন, তথা হইতে পশ্চিম দিকে কিছু দূরে যাইলে ভ্যালি গার্ডনের ফটক বা তোরণ দেখিতে পাইবেন। একই দিবসে ডল্‌ফিন্স নোজ ও ভ্যালি গার্ডেন এই উভয়ই সম্পূর্ণরূপে দেখা সম্ভব নহে সুতরাং অপর এক দিন ব্যাক ওয়াটার পার হইয়া ভ্যালি গার্ডেনে যাওয়া উচিত।

ভ্যালি গার্ডেনের অর্থ উপত্যকাস্থ উদ্যান বা পাহাড়ের নীচের বাগান। স্থানীয় মৃত জমিদার রাজা গজপতি রাওর বিধবা পত্নী ইহার

স্বত্বাধিকারিণী। বাগানটী এক্ষণে অযত্নে ও অপরিষ্কার অবস্থায় আছে, দুই পার্শ্বে জঙ্গল-পূর্ণ পাহাড়, এ কারণে ইহাকে বাগানের পরিবর্ত্তে পার্ক (Park) বা কৃত্রিম বন্য বিচরণ ভূমি বলা যাইতে পারে। দূর হইতে এই বাগানের পরিমাণ এক বা দুই বিঘা মাত্র ও এক ক্ষুদ্র জঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাতে প্রবেশ করিলে চলিয়া চলিয়া শেষ করিতে কষ্ট হয়। এই বাগান দীর্ঘে প্রায় দুই মাইল, কিন্তু তৎপরিমাণে প্রস্থে অতি অল্প; সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থানেরও বিস্তার সিকি মাইলের অধিক নহে। বাগানে অসংখ্য নারিকেল গাছ, এমন কি ইহাকে নারিকেল বাগান বলিলেও চলে; তদ্ব্যতীত আম্র আতা পেয়ারা প্রভৃতি গাছও অনেক আছে। কদলীর কয়েক ক্ষেত্র, পিঁয়াজ, লঙ্কা প্রভৃতি তরকারীর চাষ, এবং গোলাপ বেল প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষও অজস্র দৃষ্ট হয়। উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিবার অনেক পথ আছে, এবং বৃক্ষে বৃক্ষে প্রায় সর্ব্বত্র ছায়াময় ও সুশীতল। পার্শ্বস্থ পথগুলির পার্শ্বে উচ্চ পাহাড়, তাহা কোথাও অল্প কোথাও নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ। প্রবেশ-দ্বারের প্রায় সিকি মাইল দক্ষিণে এক মনোহর উদ্যান-বাটিকা বা "বাঙ্গালা" আছে। উহা সকল সময় বন্ধ থাকে। তবে সত্বাধিকারিণীর নিকট আবেদন করিলে উহাতে দিবা বা রাত্রিবাসের অনুমতি পাওয়া যায়।

তিনটী বৃহৎ কূপ হইতে বাগানের উত্তরাংশে জল সেচন হয়। দক্ষিণে এক ঝরণা দ্বারা জলের সংস্থান হয়। উহার নিকট পৌঁছিতে মধ্যস্থ এক পাহাড় বেষ্টন করিয়া প্রায় দেড় মাইল ক্রমোচ্চ পথে হাঁটিতে হয়। অত না হাঁটিয়া ঐ পাহাড় উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবারও এক পথ আছে, তবে তাহা কিছু পরিশ্রম-সাধ্য, কিন্তু উৎসাহী ব্যক্তিরা বা যাঁহারা সমুদয় দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাহাতে কাতর হন না। সর্ব্ব-দক্ষিণে এক পাহাড় হইতে এই ঝরণা-স্রোত নিঃসৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার মূল

দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ঐ পাহাড়ের উপর অনেকটা উঠিয়াও মূল দেখিতে পাই নাই। উঠিবার কোন রাস্তা নাই। আমি পাথর ধরিয়া ধরিয়া উঠিয়াছিলাম এবং সেইরূপে নামিয়াছিলাম। এখানকার স্থানীয় লোকেরা এই পাহাড়ে উঠিতে সাহস করে না, কারণ তাহারা বলে ইহা বিষাক্ত সর্পে পূর্ণ এবং আমার একাকী তথায় যাওয়া শুনিয়া তাহা অন্যায় দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়াছিল। উহা শুনিয়া কিন্তু অনুতাপের পরিবর্ত্তে বরং আমার আনন্দ হইয়াছিল, কারণ যেখানে যত বিপদের সম্ভাবনা, সেই খানেই তত যাইতে—বিশেষ লোকে ভয় দেখাইলে—আমার তত ইচ্ছা ও উৎসাহ হয়। এইরূপ অনেক বার অনেক কাণ্ড করিয়াছি এবং কোন কোন বার বিপদেও পড়ি নাই তাহা নহে, তবে তাহাতে দমি নাই। অবশ্য অন্য কাহাকেও আমার অনুকরণ করিতে বলি না, আমার নিজের কাণ্ড মাত্র বলিয়া প্রকাশ করিলাম।

বৃক্ষরাজিপূর্ণ ছায়াময় সুশীতল নির্জ্জন স্থানে যিনি বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকট আমি এই ভ্যালি গার্ডেন নির্দ্দেশ করি। প্রতিদিনই অনেকে এখানে বেড়াইতে আসে, তবে বিশেষ সময় এখানকার প্রধান উৎসব (২০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পঙ্গলের তৃতীয় ও চতুর্থ দিন অর্থাৎ ১লা ও ২রা মাঘ স্থানীয় অসংখ্য লোক—বালক যুবক বয়স্ক—সুসজ্জিত হইয়া এখানে বিচরণ করিতে ও আমোদ প্রমোদ করিতে আসে। ঐ দুই দিন এখানে আসা যেন ঐ পর্ব্বের এক অঙ্গ বা নিয়ম। রঙ্গ বেরঙ্গের সাজের লোকের জনতায় বাগান রঞ্জিত হইয়া যায়, এবং খেলা ও দল বাঁধিয়া বসিয়া গল্প গুজবের ধূম পড়িয়া যায়।

সীমাচল যাত্রা—পথের দৃশ্য।

(১৫)

সীমাচল এপ্রদেশের প্রধান তীর্থ বা মহাতীর্থ। এখানে কোন হিন্দু দুই দিনের জন্য আসিলে এক দিন সীমাচল দর্শনে প্রয়োগ করেন। এ প্রদেশে সীমাচলের মাহাত্ম্য এত খ্যাত যে, অনেকে উহাকে 'দক্ষিণের কাশী' বলে। কথিত আছে, এই সীমাচল গিরির শিখর হইতে হিরণ্য-কশিপু তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে নিম্নে নিক্ষেপ করেন, এবং বিষ্ণু তাহাকে রক্ষা করেন; এজন্যও ইহা হিন্দুদের নিকট মহা পুণ্য-স্থান হইয়াছে।

সীমাচল পাহাড়ের আর এক আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, উহার উপরে যে সুবৃহৎ পল্লী আছে, নিম্ন হইতে তাহার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না; অর্দ্ধ পথে উঠিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না যে উপরে কিছু আছে। তাহার পর যখন সর্ব্বোপরি পৌছান যায়, তখন বিস্মিত হইতে হয় যে, নিম্ন প্রদেশ হইতে যাহাকে এক ক্ষুদ্র পাহাড় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহার উপরে নানা মন্দির বসতি রাস্তা প্রভৃতি পূর্ণ এত বড় এক পল্লী এমন গুপ্ত ভাবে থাকিতে পারে!

নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত প্রস্তর-গঠিত সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণী, মধ্য পথ হইতে ঝরণার আরম্ভ, ঝরণা সকল হইতে ঝর ঝর রবে জল পতন, পথের পার্শ্বে বৃক্ষরাজি ও উদ্যান, উপরে সুন্দর মন্দির, প্রভৃতি—এ সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে অতীব আনন্দ হয়। একারণে এখানে আগত কোন বাঙ্গালীই অন্ততঃ একবার সীমাচল না যাইয়া থাকিতে পারেন না। সকলকেই

আমি উহা দর্শন করিতে অনুরোধ করি। আমার এখানে দুই মাস অবস্থিতি কাল মধ্যে তথায় পাঁচ বার গিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই।

সীমাচল দেখিবার দিন প্রত্যুষে বাটী হইতে বাহির হওয়া আবশ্যক। গাড়ী দ্বারা সীমাচলের তল-দেশ পর্য্যন্ত গিয়া, তাহার পর পদব্রজে বা পর প্রবন্ধে বর্ণিত নর-যান দ্বারা উপরে উঠিয়া, মন্দিরাদি সমস্ত দেখিয়া, বাটীতে ফিরিতে ৮।৯ ঘণ্টা সময় লাগে, অর্থাৎ অপরাহ্ন বেলা ৩।৪টা হয়। একারণে দিবসের আহারের জন্য লুচী প্রভৃতি খাদ্য পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত। সীমাচলের উপরে রন্ধনাদি করিবার যথেষ্ট উপযুক্ত স্থান আছে বটে, কিন্তু এক দিনের জন্য তথায় আমোদ বা ধর্ম্ম করিতে গিয়া পাকের আয়োজন বিরক্তিকর ও অসুবিধাজনক বোধ হইবে। সঙ্গে স্নানের জন্য বস্ত্রাদি লইবেন। এক টাকা বা আট আনার পাই ভাঙ্গাইয়া লইবেন। সীমাচলে এত ভিক্ষুক যে, তাহাদের সকলকে এক এক পয়সা দেওয়া অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে। আর সেখানে দানের সাধারণ চলিত পরিমাণও এক পাই মাত্র, উহা পাইলেই ভিক্ষুকেরা সন্তুষ্ট হয়।

এখান হইতে সীমাচল পাহাড় দশ মাইল দূরে। অত্রত্য গাড়ীর— ব্যাণ্ডী ও ঝট্কার—বর্ণনা পূর্ব্বে (১০ম প্রবন্ধে) করিয়াছি। ব্যাণ্ডি অর্থাৎ গো-বাহন গাড়ী দ্বারা সীমাচল-তল পর্য্যন্ত যাতায়াতের নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ১।০, কিন্তু বাঙ্গালীদের নিকট হইতে দুই চারি আনা অধিক আদায় করিয়া থাকে। ঝট্কা অর্থাৎ অশ্ব-বাহন গাড়ীর ভাড়া ২॥০— ৩৲। কিন্তু এই দীর্ঘ উচ্চ-নিম্ন পাহাড়ে পথে ঝট্কার অশ্ব বাণ্ডীর গরু অপেক্ষা বড় অধিক দ্রুত যাইতে পারে না, বরং কোন কোন ঝট্কা ব্যাণ্ডী অপেক্ষা অধিক সময়ও লইয়া থাকে। ব্যাণ্ডীতে

যাইতে ২॥-৩ ঘণ্টা, ও ফিরিতে (ফিরিবার সময় অনেক ঢালু পথ পাওয়ায়) ২-২॥ ঘণ্টা লাগে। আমি বাইসিকলে যাতায়াত করিতাম; আমার যাইতে সওয়া ঘণ্টা ও আসিতে ৫০ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা লাগিত। চড়াই পথ সকল উঠিতে যেমন পরিশ্রম হইত, তেমনই আবার ঢালু পথে বেশ সুখ হইত, আমার পদ-চালনা বিনা বাইসিকল আমাকে মহাবেগে বহিয়া লইয়া যাইত।

রেল দ্বারা সীমাচল ষ্টেষণ হইয়াও সীমাচলে যাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ও কষ্ট; কারণ, প্রথমতঃ সুবিধা-জনক সময় মত তথায় যাইবার ট্রেণ নাই; তাহার পর সীমাচল ষ্টেষণে সকল সময় গাড়ী পাওয়া যায় না, সেখান হইতে সীমাচল পাহাড় পর্য্যন্ত পৌনে তিন মাইল পার্ব্বত্য পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। একারণে এখান হইতে গাড়ী দ্বারাই সকলে যাইয়া থাকেন।

ভিজাগাপত্তন সহর হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর যাইলে এক বৃহৎ বাটী দেখা যাইবে। উহার উপরিস্থ মেরীমূর্ত্তি ও ক্রুশ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের এক আড্ডা। এখানে রোমান্ ক্যাথলিকদিগের ননেরা বাস করেন। ধর্ম্ম ও পর-হিতের জন্য সংসার-ত্যাগকারিণী রমণীদিগকে নন্ বলে।

আর একটু অগ্রসর হইলে ডিষ্টিলরী বা মদ চোলাইখানার বৃহৎ সরকারী বাটী চক্ষুতে পড়ে। ইহার কিছু দূরে টোল-খানা। ইহা এক পাতার ঘর। যাইতে যাইবার সময় তথায় কিছুই দিতে হয় না, ফিরিবার সময় টোল দিতে হয়। কিন্তু ঐ টোল গাড়োয়ানের উপরোক্ত ভাড়ার অন্তর্গত, উহা গাড়োয়ান দিবে, তবে আরোহী নূতন ব্যক্তি হইলে গাড়োয়ান ফাঁকি দিয়া উহার পয়সা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে চেষ্টা করে। বাইসিকলের কোন টোল লাগে না।

পথ সমস্ত ভাল, তবে পাহাড়ে পথ হেতু কোথাও ক্রমে উচ্চ হইয়াছে, কোথাও বা ঢালু হইয়া নিম্নে নামিয়াছে। পথের ধারে বরাবর ইংরাজিতে মাইলের সংখ্যা ও তাহার অষ্টমাংশগুলি প্রস্তর-ফলকে খোদিত আছে। ৫ মাইল পরে পথের পার্শ্বে এক বৃহৎ বাটী ও পথের উপর তাহার আস্তাবল আছে। উপরোক্ত ডিষ্টিলরীর পরে ইহাই একমাত্র ও শেষ বাটী। ইহার পরে অবশিষ্ট পথ প্রায় জনশূন্য, কেবল কোন কোন স্থানে সামান্য কুটির মাত্র, এবং মধ্যে মধ্যে বিচরণকারী পালিত মহিষকুল দেখা যায়। নিকটে ও দূরে পাহাড়, সীমাচলের সমস্ত পথ যাবৎ পাহাড় কখন সঙ্গ ছাড়ে না।

৭। মাইল পরে রাস্তার দুই মুখ হইয়াছে, সেই স্থানে এক সাইন্‌-বোর্ড আছে; তথাকার কোন্ দিকে সীমাচল ও তথা হইতে কত দূর (২৮ মাইল), ইহা ইংরাজিতে ঐ সাইন-বোর্ডে লিখিত আছে।

সীমাচলের নিম্নস্থ স্থান সকল হইতে সীমাচল পাহাড় ও উপরের মন্দির প্রভৃতি সমুদয় বিজয়নগ্রামের মহারাজার সম্পত্তি। তিনি যাত্রীদের বাসের জন্য ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সীমাচলের নিকটে পৌঁছিলে প্রথমে ব্রাহ্মণদের জন্য ধর্ম্মশালা বা দীর্ঘ গৃহশ্রেণী চক্ষে পড়ে; এ গুলি অতি উত্তম। শূদ্রদের জন্য কিছু দূরে স্বতন্ত্র ধর্ম্মশালা আছে। ইহা কলিকাতার গাড়ীর আস্তাবলের মত অর্থাৎ সম্মুখ ভাগ খোলা, উপরে ছাদ, একহারা সুদীর্ঘ হল, স্বতন্ত্র থাকিবার উপযুক্ত দ্বার-বিশিষ্ট ঘর নাই। সম্ভ্রান্ত যাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র এক বৃহৎ বাটী আছে, কিন্তু তাহার ভগ্ন দশা, প্রায় কোন ঘরেরই ছাদ নাই, তাহা পড়িয়া গিয়াছে। বিজয়নগ্রামের মহারাজার ন্যায় ব্যক্তি তাঁহার সম্পত্তির এরূপ শোচনীয় অবস্থা করিয়া কেন রাখিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। এই বাটীতে রাজার কর্ম্মচারীরা অবস্থান করেন। বাইসিকল করিয়া যাইলে তাহা এই

বাটীর ভিতরে রাখিয়া পাহাড়ে উঠিতে পারেন। নিকটে কয়েকখানা দোকান আছে, তাহাতে কলা নারিকেল ও স্থানীয় মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাওয়া যায়। সীমাচলের মন্দিরে পূজা দিবার জন্য নারিকেল প্রভৃতি এখানে ক্রয় করিতে হইবে, উপরে পাওয়া যাইবে না।

উপরোক্ত বাটীতে সংলগ্ন এক বৃহৎ উদ্যান আছে, তাহা এখানকার প্রথম দেখিবার বস্তু। এই বাগানে গোলাপের বিস্তর চাস রহিয়াছে, বেল, চামেলী, জুঁই, রজনীগন্ধ প্রভৃতিরও গাছ আছে। বাঙ্গালা দেশে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বেল ফুলের দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে পৌষ মাসে প্রস্ফুটিত বেল ফুলের সুমধুর গন্ধ ভোগ করিয়াছি। কয়েকটী শিউলী ফুলের গাছে প্রস্ফুটিত ফুল দেখিলাম। এই ফুলকে এখানে পারিজাত (বা পারিজাতম্) বলে। গোলাপকে রোজা ফুল বলে। কদলীর গাছ অসংখ্য রহিয়াছে। অনেক বিচিত্র-গঠন ফোয়ারা আছে, কিন্তু সকলগুলিই জলধারা-শূন্য। সর্ব্বনিম্নে বাটীর পূর্ব্ব পার্শ্বে এক ফোয়ারা দিয়া তলস্থ চৌবাচ্চায় জল পড়িতেছে। নিকটে পাহাড়ের গাত্রে বহুদূর উপর পর্য্যন্ত আনারসের চাস দেখিলাম। অসংখ্য আনারসের গাছগুলি দীর্ঘ লাইন লাইন করিয়া পর পর রোপিত। দার্জ্জিলিঙ্গের পাহাড়-গাত্রে যেমন চায় ক্ষেত্র, দূর হইতে ইহাও সেইরূপ অনেকটা বোধ হয়; বস্তুতঃ প্রথম দর্শনে আমি চায় ক্ষেত্রই মনে করিয়াছিলাম।

কিন্তু এই উদ্যানের বিশেষ চমৎকারিতা ও নূতনত্ব এই যে, ইহা স্তরে স্তরে গঠিত। উদ্যানের প্রথম অংশ শেষ হইলে দেখিবেন, তথায় উপরে যাইবার সোপান রহিয়াছে। সেই সোপান দ্বারা উপরে উঠিলে—যেমন বাটীর একতল হইতে দ্বিতলে উঠিলে—আবার এক নূতন স্তর আবির্ভূত হইবে, তাহাও বৃক্ষে পরিপূর্ণ। আবার তথা

হইতে পুনরায় সোপান দ্বারা উপরে উঠিলে, উদ্যানের তৃতীয় স্তর চক্ষু-গোচর হইবে। সর্ব্ব-শেষ স্তরে ঝরণা চৌবাচ্চা ও ফোয়ারা আছে। ঝরণা দ্বারা উপর হইতে জল পড়িতেছে, এবং চৌবাচ্চার তল-দেশস্থ ফোয়ারা হইতে জল উপরে উঠিতেছে। এরূপ স্তরে স্তরে গঠিত উদ্যান আর কোথাও দেখি নাই। তবে পাহাড়ের তলদেশস্থ ক্রম নিম্ন ভূমি পাওয়াতেই এই স্তর-বিশিষ্ট উদ্যান প্রস্তুত করিবার যে সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

এখানে আসিয়া প্রথমে এই উদ্যান দেখিবেন, তাহার পর সীমাচলে আরোহণ করিবেন। কারণ অগ্রে সীমাচলে উঠিলে ফিরিবার সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, বেলাও অধিক হইবে, তখন আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগান দেখিতে ভাল লাগিবে না। বাগানের ফুল জমা দেওয়া আছে। রক্ষকদিগকে কিছু—দুই এক আনা—দিয়া ফুল সংগ্রহ করিতে পারেন।

সীমাচলে আরোহণ।

(১৬)

উদ্যান দেখার পর সীমাচল পাহাড়ে উঠিবার উদ্যোগ করিতে হইবে। উদ্যান-বাটীর দ্বার হইতে পূর্ব্ব দিকে কিছু দূর যাইলে পাহাড়ের উপরে উঠিবার সোপানগুলি দেখা যায়। হাঁটিয়া উঠিলে সঙ্গীয় দ্রব্যাদি লইবার জন্য এক কুলী রমণী লইবেন, তাহার যাওয়া আসার মূল্য ৵০। সোপানের কিছু দূর হইতে ভিক্ষুকের দল আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার পর উপরে বহু দূর পর্য্যন্ত ভিক্ষুকেরা সোপানে সোপানে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছে। উঠিবার সময় কিছু দিবেন না, বলিবেন—নামিবার সময় দিব। ইহাতে ভিক্ষুকেরা আর তখন বিরক্ত করিবে না। নতুবা, উঠিবার সময় দিলে, পুনর্ব্বায় নামিবার সময়ও ভিক্ষুকেরা ধরিবে, কিছুতেই ছাড়িবে না।

কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজায় অনেকে চড়িয়াছেন। কলিকাতার মনুমেণ্টও সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু উহাদের অপেক্ষা প্রাচীন দিল্লীর কুতব-মিনার উচ্চতর। ইহার উচ্চতা আমার ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হইতেছে ২৪০ ফুট, সোপানগুলিও সম্ভবতঃ পাঁচ শতের মধ্যে হইবে। কিন্তু সীমাচলের সোপানের সংখ্যা ১,০৩৮। ইহাতে সীমাচল কত উচ্চ, তাহা মনে ভাবুন। তবে এত সোপান শুনিয়া এবং নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত যতদূর চক্ষু যায় কেবল সোপানই দেখিয়া, নিতান্ত অসমর্থ অলস বা বিলাসী ব্যক্তিরা ভয় পাইতে পারেন; কিন্তু সাধারণ স্বাস্থ্য ও বল-বিশিষ্ট লোকের

পক্ষে এই সোপানাবলী আরোহণ পরিশ্রমজনক হইলেও বিশেষ দুরূহ কার্য্য নহে; এ দেশের স্থানীয় ব্যক্তিদের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালী ৮।১০।১২ বৎসরের বালকেরাও অবলীলাক্রমে আরোহণ করে। আমি এক জন হাঁপানী রোগগ্রস্ত ব্যক্তি—অবশ্য সে সময়ে হাঁপানীর আক্রমণ ছিল না—বিনা বিশ্রামে সমস্ত পথ উঠিতে পারিতাম, এবং তাহাতে ২৮॥ মিনিট মাত্র সময় লাগিত। যাঁহারা আমা অপেক্ষাও অক্ষম, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু বিশ্রাম করিয়া উঠিতে পারেন।

যাঁহারা হাঁটিয়া উঠিতে একান্তই অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাঁহাদের জন্যও বন্দোবস্ত আছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত বাটীতে দুই পাল্কী ও এক তঞ্জাম আছে। উহা বিজয়নগ্রামের মহারাজার সম্পত্তি, তাঁহার এস্থানস্থ আমীন বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে বিনামূল্যে ব্যবহার করিতে পারা যায়। আমীন না থাকিলে তাঁহার নিম্নস্থ পেস্কারের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাঁরা ইংরাজি জানেন, এবং ভদ্র লোকের অনুরোধ রক্ষা করেন। নিতান্তই পাল্কী ও তঞ্জাম না পাইলে ডুলী বা উল্টা খাটিয়ার অভাব হইবে না। তাহার পর বাহক বা বেহারাদিগকে সংবাদ দিতে হইবে। নিকটেই তাহারা থাকে। প্রতি আরোহীর জন্য ৮ জন বেহারার প্রয়োজন, কিন্তু ১২ জন পর্য্যন্ত সঙ্গে চলে। শৈলোপরি উঠা ও নামা এই উভয়ের নির্দ্দিষ্ট মূল্য ২৲, তা যে কয় জনই বহন করুক। অতঃপর আরোহীকে লইয়া তাহারা দ্রুত বেগে কিন্তু অতি সাবধানতার সহিত উপর উঠিবে এবং সমস্ত পথ এক অদ্ভুত সুর করিয়া কেবল হো-কো-কো হো-কো-কো বলিতে থাকিবে। এই হো-কো-কোর উচ্চারণের রকম শুনিলে না হাসিয়া বা আমোদিত হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

সমুদয় সোপান প্রস্তরে প্রস্তুত, প্রশস্ত, এবং প্রায় সকল স্থানেই ভাল অবস্থায় আছে। উপর পর্য্যন্ত সোপানাবলীর দুই ধারে প্রাচীর-প্র[illegible]

প্রস্তরে প্রস্তুত নানা দেব-দেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে ও সম্ভবতঃ তৎসহিত হাঁপাইতে হাঁপাইতে, অর্দ্ধ পথ উঠিয়াও, উপরে যে মন্দির গ্রাম প্রভৃতি আছে, তাহার বিন্দু মাত্র আভাসও পাইবেন না, দেখিবেন পাহাড়ের অন্ত নাই, সিঁড়িরও অন্ত নাই।

আরও কিছু উঠিলে উর্দ্ধে এক প্রস্তর-গঠিত প্রাচীর ও তন্মধ্যে এক অপ্রশস্ত প্রবেশ-দ্বার বা ফটক বা তোরণ দৃষ্ট হইবে, উহার ভিতর দিয়া সোপান-শ্রেণী উপরে গিয়াছে। নিম্ন হইতে ৬১৮ সোপান উপরে এই তোরণ অবস্থিত। (৯ম চিত্র দেখুন।) এই স্থানের সিঁড়িগুলি ভয়ঙ্কর চড়াই। নিম্ন হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আগত ক্লান্ত অনেক পথিকের প্রথমে এই তোরণ ও তাহার চড়াই দেখিলে হৃৎকম্প হইবে; তাঁহাদিগকে এই স্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করি, তাহার পর ঐ তোরণের নিকট উঠিতে আর কষ্ট বোধ হইবে না। তোরণের পার্শ্বে হনুমান ধারা নামক ঝরণার জল প্রাচীরের উপর হইতে পড়িতেছে, এবং তাহার পার্শ্বে আর একটী ক্ষুদ্র ধারা আছে। এই ধারাদ্বয়ের জলশীকরযুক্ত সুশীতল বায়ুতে দেহ জুড়াইয়া যাইবে, তাহাতে নব বলাধান হইবে।

এই স্থান হইতে নির্ঝরিণী সকলের—যাহাদের জন্যই প্রধানতঃ সীমাচল পাহাড়ের সুখ ও সৌন্দর্য্য—তাহাদের আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের দৃশ্যে, জল-পতনের মধুর শব্দে, জল-সম্পৃক্ত শীতল বায়ু সংস্পর্শে পথ-শ্রান্তির লাঘব হইবে এবং তৎসহিত হৃদয়ে উৎসাহ হইবে। ঝরণার জল যেখান যেখান হইতে বাহির হইতেছে, তথায় কোথাও মনুষ্যের মুখ, কোথাও গরুর মুখ, কোথাও হনুমানের মুখ, বা অন্য কিছু গঠন করিয়া দেওয়া আছে। সেই সকল মুখের ভিতর দিয়া জল বাহির হইতেছে।

৯ম চিত্র।

(৮৮ পৃষ্ঠা।)
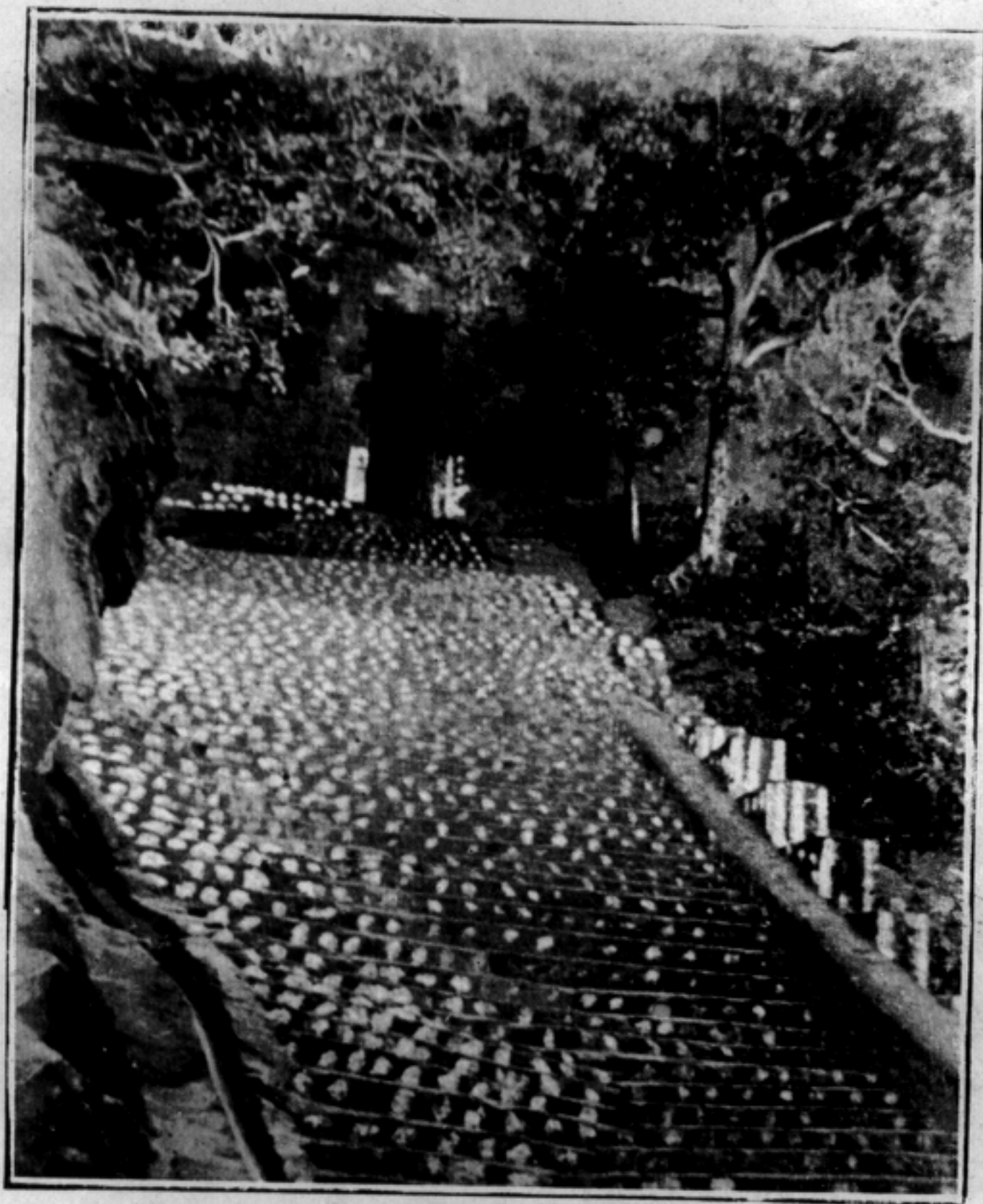
সীমাচলের সিঁড়ীর অত্যন্ত চড়াই অংশ ও প্রথম ফটক।

স্ব-ন্ত্র নাম আছে, উহার মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির নাম আমি নিম্নে বলিতেছি। প্রায় প্রায় সকল ধারার নিকটেই স্নানাদির জন্য উত্তম বন্দোবস্ত আছে।

উপরোক্ত প্রথম তোরণের কিছু উপরে এক ক্ষুদ্র মন্দির এবং তাহার সম্মুখে ৬১৩ সোপানে যাত্রীদের জন্য বিশ্রাম-গৃহ আছে। যাঁহাদের ইচ্ছা এইখানে থাকিয়া বিশ্রাম ও রন্ধন ভোজনাদি করিতে পারেন। ইহার উপরে ক্রমে পিচ্ছি ধারা, ৭৭০ সোপানে অন্নপূর্ণা ধারা, ৭৮৫ সোপানে আকাশ ধারা আছে। আকাশ ধারার জল আমাদের প্রায় দেড় তল উচ্চ হইতে নিম্নে পড়িতেছে। এই খানে বিষম চড়াই সিঁড়ী শেষ হইয়াছে। অতঃপর সোপান-পথ অপেক্ষাকৃত ভাল ও অল্পতর কষ্টকর। ৮০৩ সোপানে দ্বিতীয় তোরণ এবং ৯৮৬ সোপান উত্তীর্ণ হইলে সমতল বস্তী বা গ্রাম দৃষ্ট হইবে। এই বস্তীর ভিতর দিয়া গিয়া আরও কিছু উপরে উঠিলে ১,০১৭ সোপানে গঙ্গা ধারা, তাহার নিকট পুষ্কর ধারা, এবং শেষ ১,০৩৮ সোপানের পার্শ্বে পুত্র ধারা দেখিতে পাওয়া যাইবে। পুত্র ধারায় পৌঁছাইলেই উঠা শেষ হইল। এই স্থানের বস্তীতে ঘর ভাড়া করিয়া থাকা ও রন্ধনাদি করা যাইতে পারে।

ধারাগুলির নাম দেখিয়া মনে হইতেছে যে, এখানে যদি পাণ্ডা থাকিত এবং কাশী প্রভৃতি স্থানের ন্যায় তাহারা চালাক হইত, তাহা হইলে অজ্ঞ হিন্দুদিগকে বিশেষতঃ হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে ভুলাইয়া অর্থোপার্জ্জনের কেমন সুবিধাই না পাইত। যথা, এইরূপ বলিলেই চলিত যে, গঙ্গা ধারায় স্নান দানে গঙ্গোত্রীতে স্নান দানের ফল, আকাশ ধারায় স্বর্গের গঙ্গা বা মন্দাকিনীর ফল, পুষ্কর ধারার সুদূর দুষ্কর পুষ্কর তীর্থের ফল হয়, অন্নপূর্ণা ধারায় কাশীর অন্নপূর্ণা বিরাজ করিতেছেন, এবং পুত্র ধারায় স্নান দানে

সীমাচলের বসতি-স্থানগুলির মধ্যে পুত্র ধারা সর্ব্বোচ্চ, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে আনুমানিক ৫।৬ শত ফুট উচ্চ। কিন্তু ইহাও সীমাচল শৈলের চূড়ায় নহে উহার গাত্রে অবস্থিত। এখান হইতে আরও অনেকটা উঠিলে শিখর পাওয়া যায়, তাহার উচ্চতা ৮০০ ফুট। সীমাচলের অন্য সকল জল-ধারার মূল পুত্র ধারা, অর্থাৎ এই ধারার জল নিম্নে যাইয়া অন্য ধারাগুলির মুখ হইতে বাহির হইতেছে। পুত্রধারার মূল আমি অনেক উপরে উঠিয়াও খুঁজিয়া পাই নাই, এই পুত্র ধারা দ্বারাই অদৃশ্য পর্ব্বত-গহ্বর হইতে জল প্রথম বাহির হইয়াছে।

পুত্র ধারার উপরে বিশ্রামার্থ প্রস্তর-নির্ম্মিত দালান আছে। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম পূর্ব্বক স্নানের জন্য ঐ ধারায় অবতরণ করিবেন। অন্য সকল ধারা অপেক্ষা পুত্র ধারা সুন্দর। উহার এক দিকে নামিবার জন্য প্রশস্ত সোপান, অপর তিন দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত বিবিধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত, তন্মধ্যে প্রকাণ্ড সর্পের ফণার নিম্নে শিব-লিঙ্গ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পূর্ব্ব দিকে এক বিচিত্র-গঠিত মুখ হইতে অজস্র ধারে দিবা-নিশি জল পড়িতেছে।

নিম্ন হইতে উপরে উঠিয়া গুরু পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর পুত্র ধারার নিম্নে বসিয়া তাহার সুশীতল জলে স্নান করিলে দেহে এমন পরিতৃপ্তি ও সুখ বোধ হয়, যে তাহা নিজে না উপভোগ করিলে বুঝিতে পারা যায় না। সময়ে সময়ে এত স্নানার্থী উপস্থিত হয় যে, প্রত্যেকের জন্য দুই এক মিনিটের অধিক সময় হয় না। এই ভিড় কমিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলে পরে নিজের পূর্ণ মাত্রায় স্নানের সুখ পাওয়া যাইতে পারে। এক মাত্র পুত্র ধারায় এই স্নান-সুখের লোভেই আমি কয়েক দিবস বাইসিকলে বিশ মাইল যাওয়া আসা ও এই উচ্চ পাহাড়ে ১,০৩৮ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পদব্রজে উঠা নামা করিয়াছি, পরে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া খাইয়াছি।

স্নানের সময় বিনা আহ্বানে স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা যাত্রীর নাম পিতার নাম জাতি গোত্র ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া মন্ত্র পড়াইতে থাকে, এবং পরে দুই চারি পয়সা হইতে যাত্রী বুঝিয়া অনেক অধিক না লইয়া ছাড়ে না।

নিম্ন হইতে উপরে উঠিয়া এই স্থানে স্নান পর্য্যন্ত করিতে বেলা ১১টা বাজিয়া যায়। তখন এখানকার প্রধান বিগ্রহ নরসিংহের মন্দির ভোগের জন্য বন্ধ হইয়া পড়ে, পরে ১২টা বা সাড়ে ১২টার সময় পুনরায় খোলে। সুতরাং এখান হইতে ১২টার পুর্ব্বে বাহির হইয়া কোন ফল নাই। অতএব এই সময়ে জলযোগাদি করতঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করা কর্ত্তব্য।
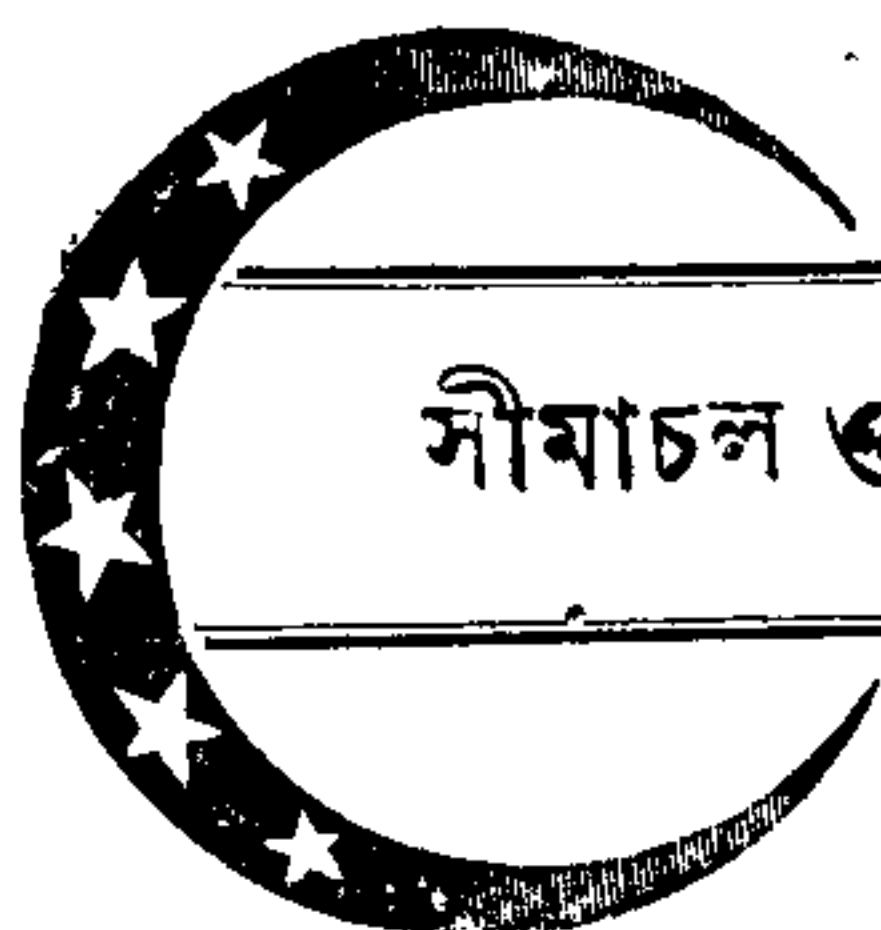
সীমাচল ও মাধো ধারা দর্শন।

(১৭)

পুত্র ধারার পার্শ্বে রাম-সীতার মন্দির। ইহা প্রথম দ্রষ্টব্য। এই মন্দির সম্পূর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং তত ভাল না হইলেও মন্দ নহে। মন্দিরের ভিতর অন্ধকার, তাহার মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরে প্রস্তুত রাম-সীতার বিগ্রহ কোন রূপে চক্ষু-গোচর করিতে হয়। এখানে দুই চারি পয়সা মাত্র প্রণামী দিলেই চলে।

তথা হইতে বহির্গত হইয়া নরসিংহ মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। এই নরসিংহ মন্দিরই এখানকার প্রধান মন্দির, এবং একমাত্র ইহার জন্যই হিন্দুর নিকট তীর্থস্থান হিসাবে সীমাচলের যত খ্যাতি গৌরব ও পবিত্রতা। পুত্রধারা হইতে কিছু অগ্রসর হইয়া ও নামিয়া ১,০০০ সংখ্যক সোপানের নিকটবর্ত্তী হইলে বাম দিকে আর এক সোপান-শ্রেণীর পথ দেখা যাইবে। এই পথ কিছু (২১ সোপান) উচ্চে উঠিয়া পুনরায় (৬৩ সোপান) নামিয়া গিয়াছে। ইহা অতিক্রম করিয়া আর একটু দূর যাইলেই নরসিংহ মন্দিরের তলদেশের তোরণ ও সোপানাবলী দৃষ্ট হইবে। তথা হইতে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ সোপান উপরে উঠিলে নরসিংহ মন্দিরের চার দিকের প্রাচীর-বেষ্টনের ভিতরে আসিয়া পৌঁছিবেন।

এই মন্দির প্রস্তর-নির্ম্মিত ও অতি বৃহদাকার। মন্দিরের চার দিকে

১০ম চিত্র।

(৯২ পৃষ্ঠা।)
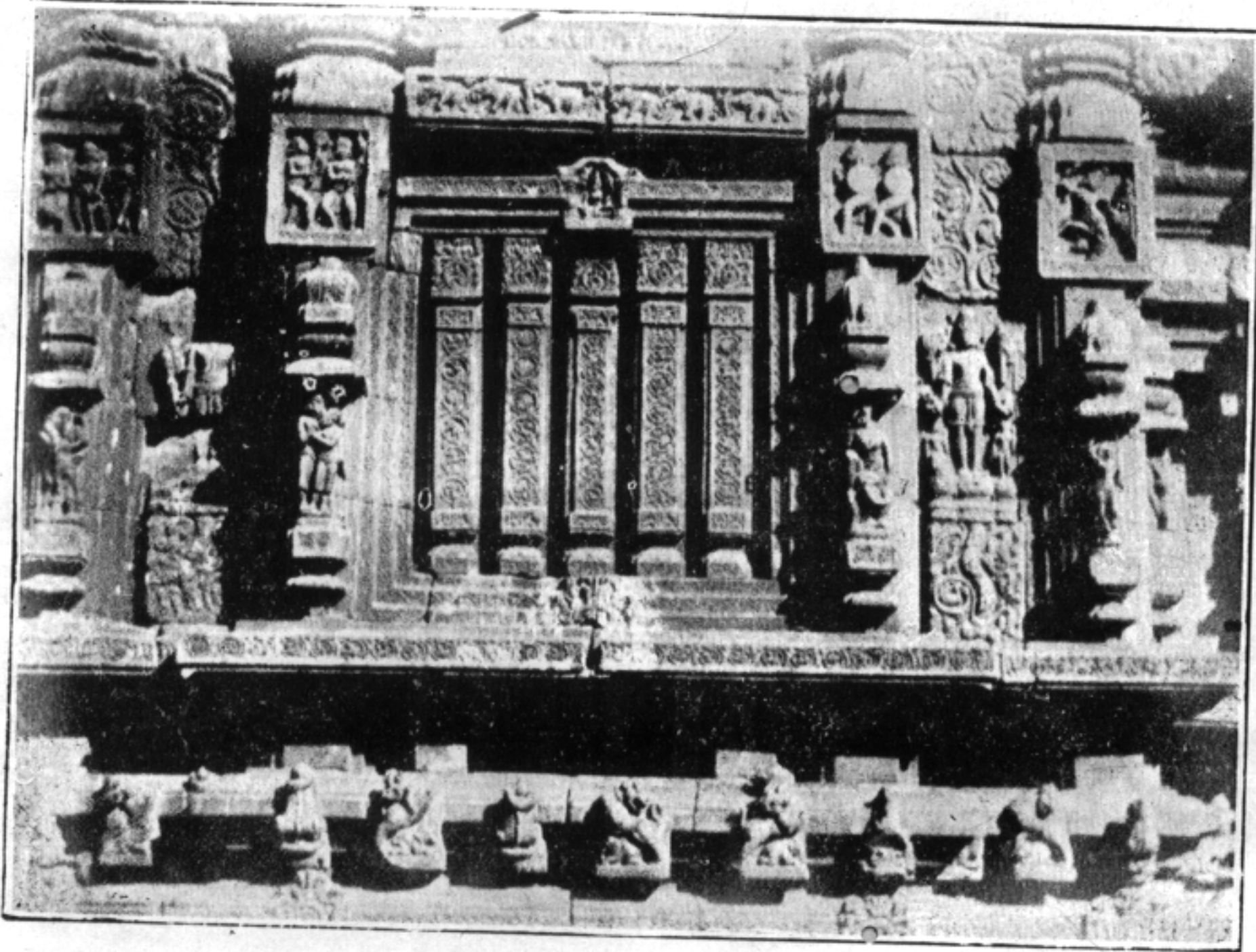
সীমাচলে নৃসিংহ-মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বের তলদেশের এক অংশ।

বিশ্রামের জন্য দর-দালান। সমুদয় স্থান প্রস্তর নির্ম্মিত, এবং সর্ব্বত্র পাতা ফুল প্রভৃতি নানা প্রকার কারুকার্য্য এবং দেব-দেবী ও নানা বিচিত্র জীব জন্তু প্রভৃতির খোদিত মূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং কালের গতিতে স্থানে স্থানে খোদিত কারুকার্য্য খসিয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি যাহা আছে, তাহাতেই এই মন্দির অতীব সুন্দর ও দ্রষ্টব্য। ইহার আভাস ১০ম চিত্রে পাইবেন। ঐ চিত্রে মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বের তল দেশের এক অংশ দেখান হইয়াছে।

মন্দিরে প্রবেশের মূল্য এক আনা, কখন কখন দুই আনাও হয়, এবং উহা দ্বার-দেশে প্রথমে দিতে হয়। ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিছু দূর যাইলে দেবতার অবস্থান-গৃহের দ্বার দেখা যায়। ভোগের সময় এই দ্বার বন্ধ থাকে। প্রায় বেলা বারটার সময় ভোগ শেষ হয়, তখন দ্বার খোলা হয় এবং যাত্রীরা প্রবেশ করিতে পারে। ভিতরে অন্ধকার, বহু ঘৃতের বৃহৎ প্রদীপ দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত থাকে, এবং তাহাতেই যাত্রীরা পথ-দর্শনে সক্ষম হয়। অনেকগুলি প্রদীপ পার হইবার পর বিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছান যায়।

যাত্রীদের পক্ষে পূজা দিবার প্রধান দ্রব্য দেখিলাম নারিকেল। উহা দেবতাকে নিবেদন করার এখানকার প্রণালী বিচিত্র। পূজকের হস্তে নারিকেল দিতে হয়। তিনি আমাদের মত দা প্রভৃতি দ্বারা না কাটিয়া এক ক্ষুদ্র মুগুরের আঘাতে নারিকেলটী ফাটাইয়া ভাঙ্গেন। তাহার পর জল-মন্দিরের মেঝিয়াতে ঢালিয়া ফেলেন এবং ভগ্ন নারিকেলের একার্দ্ধ রাখিয়া দিয়া অপরার্দ্ধ দেবতার প্রসাদস্বরূপ যাত্রীকে ফিরাইয়া দেন। নগদ পয়সার দাবী নাই, কারণ তাহা প্রথমেই দ্বার-দেশে সংগৃহীত হইয়াছে। তথাপি অধিকাংশ হিন্দু যাত্রী এখানে স্বেচ্ছায় পুনরায় কিছু কিছু দিয়া থাকেন।

কথিত আছে, হিরণ্যকশিপু যে পর্ব্বত হইতে প্রহ্লাদকে ফেলিয়া দেন ও নিম্নে বিষ্ণু রক্ষা করেন, তাহা এই সীমাচল, এবং সেই কারণে সীমাচল এপ্রদেশে এক মহাতীর্থ বলিয়া আদৃত। এখানকার লোকেরা ইহাকে "দক্ষিণের কাশী" বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোনও হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসী এ দিকে আসিলে সীমাচল তীর্থ না "করিয়া" যান না। সীমাচলের দেবতা ও এই মন্দিরের বিগ্রহ বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি। কিন্তু তাহা বৎসরে এক দিন মাত্র—বৈশাখী শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে—নর-লোকের নয়ন-গোচর হয়। শুনিয়াছি, আর এক দিনও—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে—ঠাকুর নিজ মূর্ত্তি দেখান। এই উপলক্ষে বৃহৎ মেলা ও উৎসব হয় এবং কয়েক দিন ধরিয়া চলে, এবং মান্দ্রাজ প্রেসি-ডেন্সীর নানা স্থান হইতে প্রতি দিন তিন হইতে দশ সহস্র পর্য্যন্ত যাত্রী উপস্থিত হইয়া এই গিরিমধ্যস্থ নির্জ্জন তীর্থকে আলোড়িত করিয়া ফেলে।

বৎসরের অন্য সমস্ত সময় এই নরসিংহ মূর্ত্তি চন্দনের প্রলেপ দ্বারা আবৃত রাখা হয়। শুনিলাম এই কার্য্যে বহু মণ চন্দন কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। উহা ঘষিয়া ঘষিয়া বিগ্রহোপরি ক্রমাগত প্রলেপ দেওয়া হয়; যেমন এক প্রলেপ শুখায়, অমনই তাহার উপর আবার প্রলেপ দেওয়া হয়। এইরূপে মূল গুপ্ত ক্ষুদ্র নরসিংহ মূর্ত্তি স্থূল হইয়া ক্রমে এক বৃহৎ শিব লিঙ্গের আকার ধারণ করে। তখন উহা এক পিতল-নির্ম্মিত ফাঁপা বৃহদাকার বিষ্ণু-মূর্ত্তিতে আবৃত করা হয়। এই বিষ্ণু-মূর্ত্তিই এখানকার দেবতা স্বরূপ সাধারণতঃ সকলের দৃষ্ট ও পূজিত হন। তবে কোন কোন সময় এই মূর্ত্তিকে স্নান বা অন্য কারণে স্থানান্তরিত করিলে তখন যাঁহারা দেখিতে আসেন, তাঁহারা উপরোক্ত শিবলিঙ্গাকার এক (চন্দনময়) ক্ষুদ্র স্তম্ভ মাত্র দেখিয়া যান। বিষ্ণু-মূর্ত্তিটী সুন্দর চতুর্হস্ত-

বিশিষ্ট, তিন হস্তে শঙ্খ চক্র ও গদা, অবশিষ্ট হস্তে কিছু নাই, উহা শূন্যে উত্তোলিত, ভক্তের চক্ষে উহা যেন অভয় দানের জন্য উত্তোলিত রহিয়াছে।

আসল গুপ্ত মূর্ত্তির অনুরূপ মেটে প্রস্তরে প্রস্তুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি মন্দিরের ভিতর এক ব্যক্তি বিক্রয় করে, মূল্য আকারানুসারে এক আনা হইতে চারি আনা। আমি এইরূপ একটী কিনিয়া আসলের আভাস পাইলাম, কিন্তু উহা দেখিয়া গঠনের সৌন্দর্য্য বিবেচনায় আসলের প্রতি আমার ভাল ধারণা হইল না।

বেলা ১২টার সময় ভোগ হইয়া গেলে কতক্ষণ মন্দির খোলা থাকে, এবং পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাত্রীদের পক্ষে দেব দর্শন লাভের ঐ সময়। তাহার পর মন্দির কিছুকালের জন্য বন্ধ হয় এবং তখন উৎসৃষ্ট ভোগ মন্দিরস্থ ব্যক্তিগণের ও উপস্থিত যাত্রীগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। এই ভোগ অতি সুখাদ্য। এইরূপ ভোগের বিবরণ ত্রয়োদশ প্রবন্ধে হিন্দু শৈলে বিষ্ণু মন্দিরের বিবরণে দিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার আর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দেব দর্শনের পর মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে এক বৃহৎ হল ঘরে যাইতে হয়। তথায় প্রবেশের জন্য আমাদের দলের প্রত্যেকের এক পয়সা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ইহা প্রকৃতই দিতে হয় কি আমাদের নিকট ঠকাইয়া লইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। এই ঘরের প্রতি স্তম্ভের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর ও বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত এই ঘরে অনেকগুলি অতি বৃহদাকার সুন্দর মূর্ত্তি প্রভৃতি আছে, যথা, হনুমান সখী প্রভৃতি বেষ্টিত সিংহাসনে উপবিষ্ট রাম সীতা, ইত্যাদি। অনেকগুলি মূর্ত্তির পৃষ্ঠে বসিবার স্থান সিংহাসন হাওদা প্রভৃতি আছে, এগুলি উপরোক্ত নরসিংহ দেবতার বাহন, যথা, হনুমান, কূর্ম্ম, সর্প, হস্তী, অশ্ব, হংস, গো, ইত্যাদি।

মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আরও অনেক বিগ্রহ আছে, যথা, মহালক্ষ্মী, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্ত ঋষি ইত্যাদি। এই সকল এবং চারি দিকের কারু-কার্য্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রাতে অনেক বেলা পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিয়া এই স্থানকে আরও ভক্তির উদ্দীপক ও মনোরম করিয়া তুলেন।

মন্দিরের তলদেশস্থ তোরণের বাহিরে কিছু পশ্চিমে এক বৃহৎ রথ আছে। তাহা সম্মুখস্ত প্রশস্ত রাস্তায় যথাকালে টানা হইয়া থাকে।

এইরূপে সমুদয় দেখা শেষ করিয়া মন্দিরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তর প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই সময়ে অবতরণ কালে ভিক্ষুক বিদায় করিবেন।

মাধো ধারা।

সীমাচলে যাইবার পথে মাধো ধারা নামে এক ক্ষুদ্র তীর্থ আছে। ইহা সীমাচলের ন্যায় তেমন দেখিবার বস্তু নহে; তবে যে হিন্দু বা দর্শক কিছুই বাকি না রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জন্য ইহার সংক্ষেপ বর্ণনা করিব।

পথ এক হইলেও সীমাচল ও মাধো ধারা এই দুই স্থানে এক দিনে যাওয়া উচিত নহে, যাইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। স্বতন্ত্র দিনে যাওয়া কর্ত্তব্য। ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজাগাপত্তন হইতে সীমাচলে যাইবার পথে যথায় ৪র্থ মাইলের প্রস্তর-ফলক আছে, তাহার কিছু অগ্রে ডান দিকে এক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে; এই রাস্তা ধরিয়া দেড় মাইল অপেক্ষা কিছু অধিক দূর যাইলে মাধো ধারায় পৌঁছান যায়। রাস্তা নিতান্ত মন্দ না হইলেও ভাল নহে এবং শেষ সিকি মাইল অতি মন্দ।

পাহাড় ও বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ নির্জ্জন বন বা উপবন ভূমি, তাহাতে তিনটী ধারা বা ঝরণা—ইহাই মাধো ধারার সৌন্দর্য্যের উপকরণ। ঝরণা

১১শ চিত্র।

(৯৬ পৃষ্ঠা।)
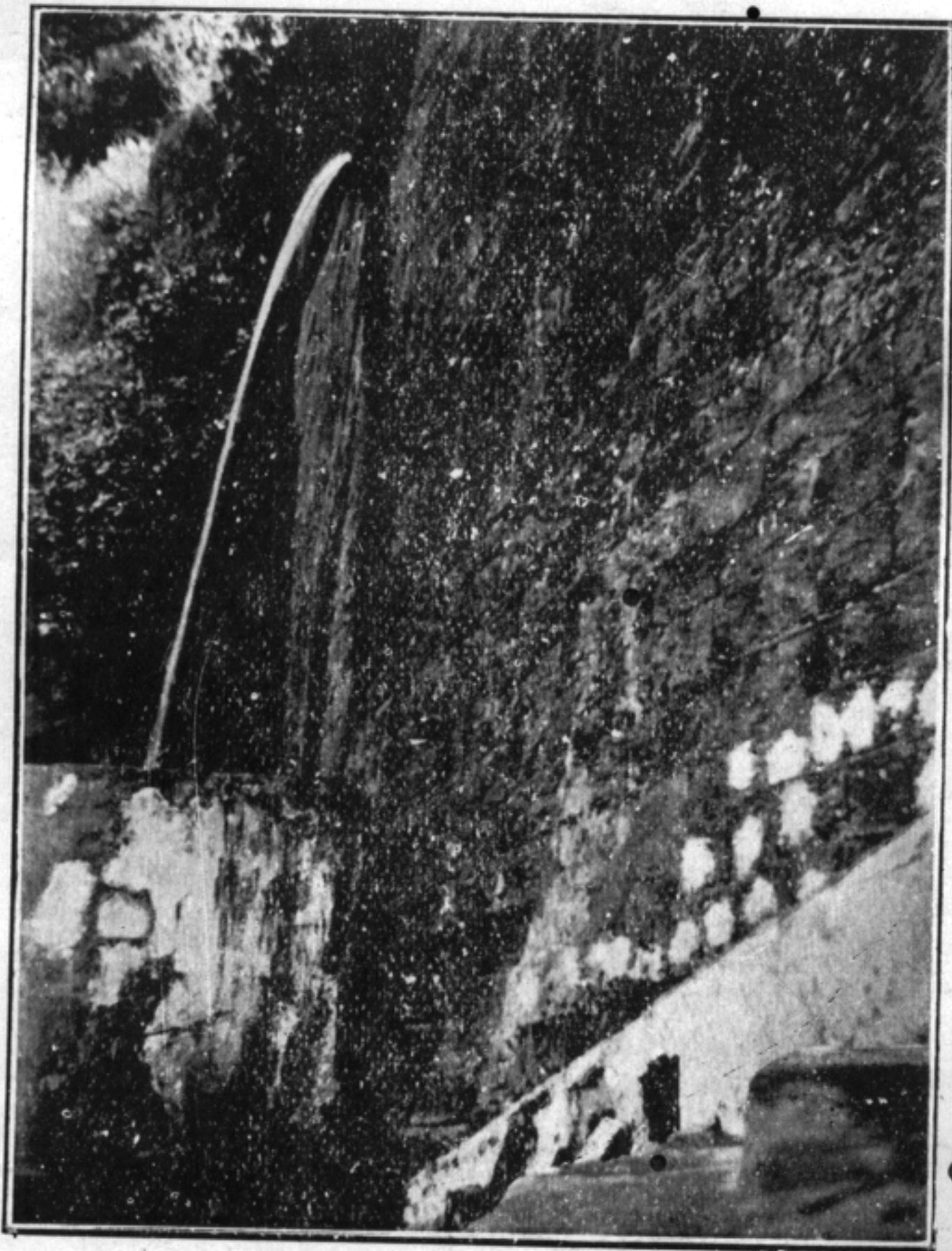
মাধোধারার তৃতীয় বা সর্ব্বনিম্ন ধারা, অনেকে ইহাকেই মাধোধারা বলে।

তিনটী পরস্পর কিছু কিছু দূরে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পাহাড়ের গাত্র হইতে ঝরিতেছে। এক ঝরণা হইতে অপর ঝরণা পর্য্যন্ত উঠিতে পরিশ্রম বোধ হইবে, কারণ পথ বন্ধুর ও প্রস্তরময়। সর্ব্বোচ্চ ঝরণার স্বতন্ত্র বিশেষ নাম পুটু ধারা অর্থাৎ প্রথম ধারা। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর; একটী গঠিত গরুর মুখ হইতে ইহার জল পড়িতেছে। ইহার নিম্নে মধ্যম ধারা, অপর দুইটী অপেক্ষা ইহা হইতে অধিক পরিমাণে জল পড়িতেছে। সর্ব্বনিম্ন তৃতীয় ধারা। সমাগত ব্যক্তির চক্ষে এইটী প্রথমে পড়ে, এবং কেহ কেহ আর উপরে না উঠিয়া এইখানে কার্য্য সমাপ্ত করে, এই কারণে অনেকে ইহাকেই মাধো ধারা বলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার জলের মূল এক, প্রথম ধারার স্বতন্ত্র। পাহাড়ের যে স্থলে ভেদ করিয়া জল প্রথম বাহিরে আসিতেছে, তাহাকে ঐ মুখ বলিতেছি। কিন্তু মূল জল পাহাড়ের কোথায় কোন্ গুপ্ত উদরে সঞ্চিত, তাহা চক্ষুর অদৃশ্য, এবং তথায় এত জল সঞ্চিত থাকে যে সম্বৎসর দিবারাত্র অবিরাম জল পড়িয়াও ধারাগুলি কখনও জল-শূন্য হয় না।

সর্ব্ব নিম্ন ধারার নিকট বিষ্ণু প্রভৃতি দেবের এক মন্দির আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার নিতান্ত ভগ্ন-দশা। বৎসরের প্রায় সকল সময় মাধো ধারা নির্জ্জন ও নিঃশব্দ থাকে, কেবল পর্ব্ব, গ্রহণ, বিশেষ তিথি, মাঘ মাসের চার রবিবার, ইত্যাদিতে এখানে স্নানের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়, তখন নরনারী ভিখারী ও গাড়ীতে মাধো ধারা উপচিয়া উঠে ও তাহাদের কোলাহলে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া যায়। ধারা তিনটীর নিকট এত স্নানার্থীর ভিড় হয়, যে বিশেষ চেষ্টায় তবে স্নান কর্ব্বিতে পাওয়া যায়। ১১শ চিত্র দেখুন।

মাধো ধারা সীমাচল পাহাড়ের বিপরীত দিকের তলদেশে অবস্থিত, অর্থাৎ যে পাহাড়ের এক দিকে (উত্তর-পশ্চিম দিকের) ঊর্দ্ধ গাত্রে নরসিংহ

মন্দির প্রভৃতি আছে, সেই পাহাড়ের বিপরীত দিকের (দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের) তল-দেশে মাধো ধারা। মাধো ধারা দিয়া সীমাচলের মন্দিরে উঠিবার জন্য সোপান-বিশিষ্ট পথ আছে, সোপানের সংখ্যা প্রায় এক সহস্র হবে।

এখানে পাহাড়ের গাত্রে আনারস এবং নিম্নে গোলাপ ফুল ও কলা গাছের বিস্তৃত চাষ দেখিলাম। বড় গাছের মধ্যে আম গাছ অল্পস্র।
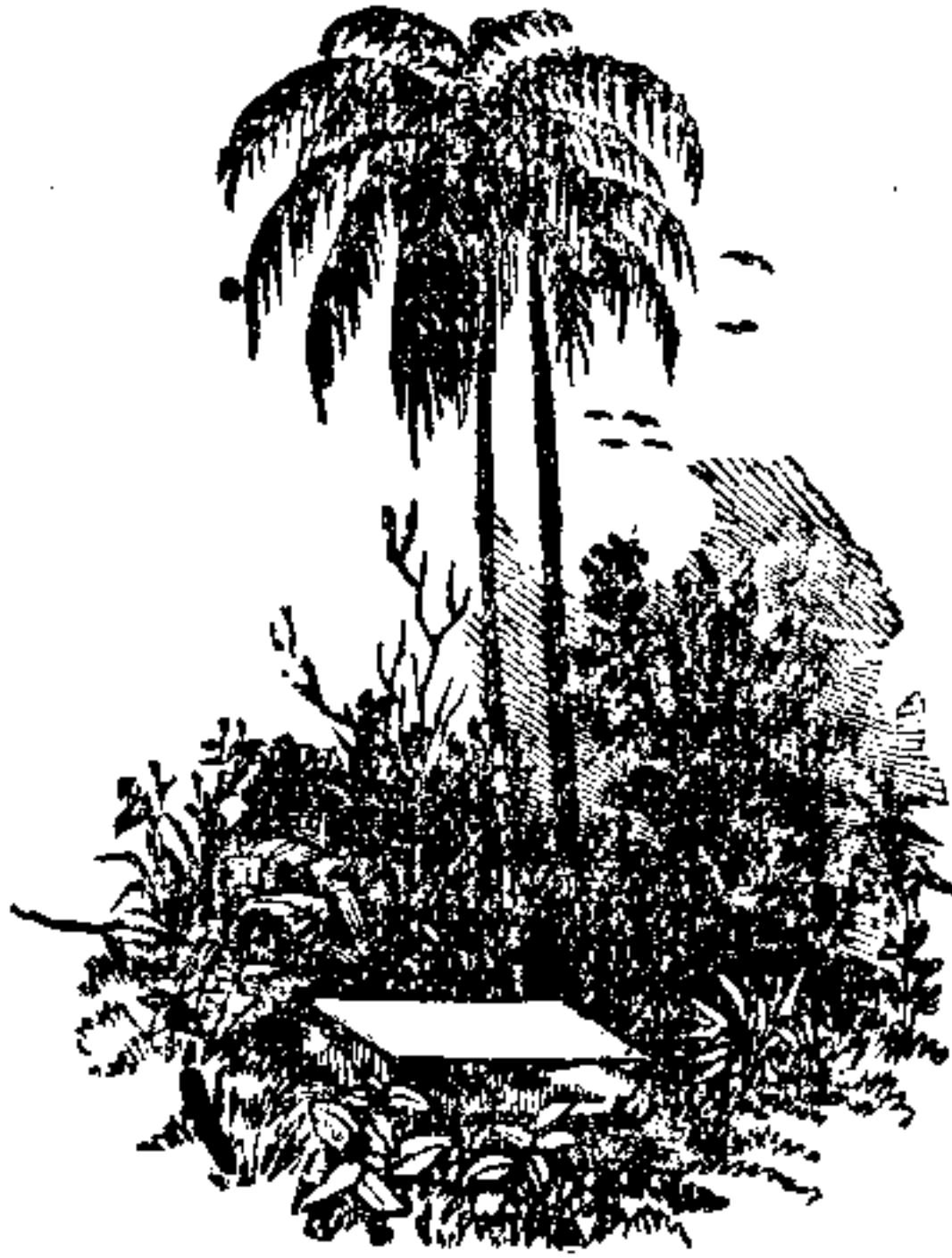
যে স্থানে কিছু দিন থাকা যায়, তথাকার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি কিছু কিছু জানা উচিত এবং জানিতে কৌতূহলও হইয়া থাকে। তদনুসারে এ স্থান সম্বন্ধে আমার ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান-ফল নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রাচীন ইতিহাসের পাঠকেরা জানেন, আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতের অধিকাংশ স্থান জঙ্গল ও নানা আদিম অধিবাসীদের আবাসে পূর্ণ ছিল। আর্য্যেরা ভারতে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রাম নগরাদি সংস্থাপনে নিযুক্ত হইলেন, এবং অগ্নি-সহযোগে অনেক স্থানের জঙ্গল নষ্ট করিতে লাগিলেন। এই জন্য বৈদিক কালে অগ্নি অন্যতম প্রধান দেবতা বলিয়া পূজিত। আদি বেদ ঋগ্‌বেদের প্রথম লাইন "অগ্নিমিলে পুরোহিতং", অর্থাৎ অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া পূজা করি। আদিম নিবাসীদের মধ্যে যাহারা আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বন করিল, তাহারা চতুর্থ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ শূদ্র হইল। আর যাহারা আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার করিল না, আর্য্যদিগ হইতে দূরে থাকিল এবং মধ্যে মধ্যে আর্য্যদের যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে লাগিল, তাহারা দস্যু, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইল। অবশ্য ঐ সকল অসভ্যেরা যে আদৌ কাঁচা মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি জঘন্য কাণ্ড করিত

না, তাহা নহে। রামচন্দ্রের সময়ে উত্তরে উড়িষ্যা হইতে দক্ষিণে লঙ্কা দ্বীপ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ঐরূপ নানা আদিম জাতিতে পূর্ণ ছিল। লঙ্কার অধিবাসীরা রামচন্দ্রের বিরোধিতা করা হেতু রাক্ষস বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। আর সমুদ্রের এ পারের অসভ্যেরা রামচন্দ্রের সহায়তা করা হেতু রাক্ষস নাম হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু বাল্মীকি মুনি তাঁহার রামায়ণে উহাদিগকে বানর হনুমান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু উহারা যে বাস্তবিক বানর হনুমান ছিল না, প্রকৃত মনুষ্য ছিল, তাহা ঐ কবিগুরু প্রকারান্তরে নিজ বাক্য দ্বারাই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, প্রকৃত বানর হনুমানেরা হাঁসে কাঁদে না, কথা কহে না, চুল বাঁধে না। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত বানর হনুমানেরা ঐ সকল কার্য্য করিত, এবং তৎকালের অসভ্যোচিত যুদ্ধ করিত, অর্থাৎ গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহার দ্বারা ও পাথর ছুঁড়িয়া যুদ্ধ করিত।

দক্ষিণাত্যের অনেক স্থানের অধিবাসীরা সেই অসভ্য আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগের বংশধর। ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত ইহার ভাষাগত প্রমাণও আছে। ভারতের যে সকল জাতি আর্য্য-রক্ত হইতে সম্ভূত, তাহাদের ভাষারও মূল সেই আর্য্য ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত। যথা, বাঙ্গালা হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতমূলক হেতু প্রমাণ করে যে, তাহাদের ব্যবহারকারীরাও সেই প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনকারী আর্য্য-দিগের সন্তান। ভারতের দক্ষিণাত্যের দুই প্রধান ভাষা তেলগু ও তামিল, সংস্কৃতের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই।

এ প্রদেশীয়দের ভাষা তেলগু এবং ইহারা সেই ভারতের প্রাচীন অনার্য্যদের বংশধর। পরবর্ত্তী একবিংশ অধ্যায়ে ইহাদের ভাষার কতক-গুলি শব্দ ও ক্রিয়া পদ দিব, তাহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, সংস্কৃতের সহিত উহাদের সংস্রব নাই। তবে এক্ষণে অনেক সংস্কৃত শব্দ

গৃহীত হইয়াছে, এবং অধিবাসীরাও অসভ্য নহে, তদ্বিপরীতে সভ্যতায় ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা নিম্ন নহে। আর ইহারা যে প্রাচীন অসভ্যদের বিশুদ্ধ বংশধর, তাহাও নহে; আর্য্য রক্তের বিলক্ষণ সংমিশ্রণ যে ইহাদের মধ্যে আছে, তাহা ইহাদের আকৃতি ও মুখের গঠন প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইহাদের ব্রাহ্মণেরা ঠিক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের মত।

ভারতের অন্যান্য স্থানের লোকের ন্যায় এ প্রদেশের লোকেরা হিন্দুর প্রধান চারি বিভাগে বিভক্ত,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (ইহার উচ্চারণ এখানে ছেত্রী), বৈশ্য, ও শূদ্র। বাঙ্গালা দেশের কায়স্থেরা এখানে ক্ষত্রিয় বা ছেত্রী, এবং বেণেরা বৈশ্য। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরা মৎস্য মাংস ভোজন করে না। ছেত্রী ও শূদ্রেরা মৎস্য এবং ছাগ ও মেষ মাংস ত খায়ই, তদুপরি কুক্কুট মাংসও বাদ দেয় না; উহা এখানে নিষিদ্ধ নহে, মৎস্যের ন্যায় চলিত। প্রতি বাটীতে মুর্গী চরিতেছে, পাক-গৃহে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। ১১শ বা দৃশ্য প্রবন্ধে (৫৮ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি যে, যে এখানে কুক্কুট-বলিগ্রহণকারী ঠাকুর পর্য্যন্ত আছেন। কিন্তু কুক্কুট-মাংস খাইলেও, এখানকার কোনও হিন্দু অহিন্দুকৃত রন্ধন বা অহিন্দুর স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করে না, এবং দরিদ্র হইলেও কোন অহিন্দুর পাচক বা ভৃত্যের কার্য্য অবলম্বন করে না। কলিকাতায় ইংরাজদের যে সকল মান্দ্রাজী আয়া দেখা যায়, তাহারা "পরিয়া" নামে স্বতন্ত্র এক অতি নীচ অস্পৃশ্য জাতি হইতে সংগৃহীত। রাজপুত ক্ষত্রিয়দের ন্যায় এখানকার ছেত্রী ও শূদ্রদের মধ্যে বরাহ মাংস ভক্ষণেও বাধা নাই। বিশেষ ছেত্রীদের বন্যবরাহ-মাংসে অত্যন্ত রুচি। কিন্তু ছেত্রী ও শূদ্রের মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা মৎস্য ও সকল প্রকার মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অনুকরণ করে।

১১শ বা দৃশ্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, এখানে হিন্দুর পূজ্য চলিত সকল দেবতার মন্দির আছে। সকল দেবতারই উপাসক আছে, কিন্তু কেবল বিষ্ণু-উপাসক ব্যতীত অন্য দেবতাদের উপাসকদের বাহ্যিক কোন চিহ্ন থাকে না; বৈষ্ণবেরা ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক (মধ্যে লাল ও দুই পার্শ্বে দুই সাদা দাঁড়ী, অভাবে কেবল এক লাল দাঁড়ী) ধারণ করে।

হিন্দুদিগের প্রাচীন প্রধান চারি জাতির স্থলে বাঙ্গালা দেশের সমুদয় লোককে প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনের প্রভেদ না রাখিয়া উহাদের সকলকে এক সমান শূদ্র করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও উপবীত গ্রহণ নাই। কিন্তু ভারতের অন্য কোথাও এরূপ দেখা যায় না। উত্তর পশ্চিমের লালারা অর্থাৎ কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়রূপে এবং বণিকেরা বা বেণিয়ারা বৈশ্য রূপে উপবীত ধারণ করেন। এখানেও ঐরূপ। ক্ষত্রিয় বা ছেত্রীদের সকলের ত উপবীত আছেই, বণিক জাতীয় সামান্য লোক ও দোকানদারদেরও পৈতা আছে। ধোপা জেলে প্রভৃতি অতি নীচ শ্রেণীরাই এখানে শূদ্র। বাঙ্গালী কোন কায়স্থ এখানে আসিলে তাঁহার জাতি কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেন ছেত্রী বলেন, এবং মন্দিরাদিতে অনাবৃত গাত্রে যাইলে যেন পৈতা পরেন, নতুবা উপরোক্ত রূপ নীচ শূদ্র বলিয়া ঘৃণিত হইবেন।

এখানে মস্তকে কেশ রক্ষার বিবিধ প্রণালী দৃষ্ট হয় এবং তন্মধ্যে অনেকগুলি দেখিলে আমাদের হাসি আসে; যথা, ক্ষুদ্র মধ্যম ও বৃহৎ টিকী, চতুর্থাংশ ও অর্দ্ধ মস্তক ব্যাপী টিকী, অর্দ্ধগোল ও সম্পূর্ণ গোল ভাবে রক্ষিত মস্তকের চুল, পশ্চাতে মুশলমানের মত বাবরী করা চুল, আবার বাঙ্গালীদের মত মস্তকের সর্ব্বত্র সমান চুল, ইত্যাদি নানা অপরূপ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও কোট কলার নেক্‌টাই প্রভৃতি সাহেবী পোষা-

কের সহিত একযোগে মস্তকে সুবৃহৎ টিকী বা খোঁপা থাকিয়া এক বিচিত্র দৃশ্যের উৎপাদন করে। কাণে ফুল বা মাকড়ী ও হাতে বালা অনেকের, এমন কি পক্ক-কেশ ব্যক্তিরও দেখা যায়। জুতা পরা বা না পরা সমভাবে প্রচলিত। মস্তকে পাকড়ী, দেহে কাপড় ও কোট, অথচ "পা খালী", এরূপ ব্যক্তি সতত চক্ষুতে পড়ে। নগ্ন পদে আদালতে ওকালতী পর্য্যন্তও করা হইয়া থাকে।

(দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য শীত-প্রধান দেশের লোকদের স্নান বড় কম;) তাহার এক কারণ ভয়ানক শীত, দ্বিতীয় কারণ অধিবাসীরা দরিদ্র, তাহাদের উষ্ণ বস্ত্রের অধিক প্রস্থ থাকে না, সুতরাং পরিহিত উষ্ণ বস্ত্র ভিজাইতে চায় না। এখানে ঐ দুই কারণ আদৌ নাই, অথচ এখানকার লোকেরা নিতান্ত স্নান-বিমুখ। এত বড় সমুদ্র সম্মুখে রহিয়াছে, তাহার সম্মান কেবল আমরা, বাঙ্গালী প্রবাসীরা, রাখিয়া থাকি; পর্ব্ব বিনা অন্য কোন দিন এস্থানবাসী কাহাকেও সমুদ্রে স্নান করিতে দেখি নাই। কেহ কেহ বলে, লবণ-জলে বস্ত্র ভিজিলে তাহা শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়। বলিতে পারি না ইহা সত্য কিনা, কিন্তু প্রকৃতই যদি সমুদ্র-স্নানে ঐ আপত্তি হয়, তবে কূপের জলে এখানে লোকে স্নান করে না কেন? উত্তম জল বিশিষ্ট কূপ এখানে ত সর্ব্বত্র ছড়াছড়ী রহিয়াছে। শত শত নর-নারী কূপ হইতে জল তুলিতেছে বহিতেছে, অথচ কাহাকেও স্নান করিতে দেখি না। আসল কথা, আদৌ স্নানেই আপত্তি। পুরুষ রমণী উভয়েই এ বিষয়ে সমান, ৫।৭ দিন অন্তর বা তাহার অধিক দিন ব্যবধানে স্নান করে। (একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বাটীতে প্রত্যহ স্নান করিয়া থাকে, আর সমুদ্রে যে স্নান করা হয় না, তাহার কারণ কোন পর্ব্ব বিনা সমুদ্রে স্নান করিতে বিধি নাই, প্রমাণ—'অপর্ব্বণি

সমুদ্র-জলস্পর্শো নিষিদ্ধঃ'।"। একটা সংস্কৃত বচন রচনা করিয়া আওড়াইতে পারিলেই হিন্দু সমাজে এইরূপ অনেক কার্য্য বা অকার্য্য শাস্ত্র-সঙ্গত হইয়া থাকে।)

(স্কুলে ইংরাজি ও তেলগু ভাষা শিক্ষা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা এ প্রদেশে সাধারণের মধ্যে ইংরাজি অধিক প্রচলিত বোধ হয়।) অনেক মন্দিরের পূজক বেশ ইংরাজি জানেন। ঘৃত প্রভৃতি সাধারণ দ্রব্যের অনেক দোকানদারেরা, এমন কি অনেক ডাক-পিয়াদা পর্য্যন্ত, ইংরাজিতে—যদিও তাহা শুদ্ধ ভাবে নহে—কথা কহিতে পারে। চলনসহি বেশ ইংরাজি কথা কহিতে পারে ও লিখিতে পারে, মাসিক ১০৲।১৫৲ বেতনে এরূপ লোক এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বালিকা-বিদ্যালয় আছে, বালিকা-শিক্ষা প্রচলিত আছে, তবে তাহা বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয় না।

(নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য করে। বাজারে স্ত্রী মুটিয়ার সংখ্যাই অধিক নলক নাকে ১২।১৩ বৎসরের বালিকারা মাথায় কাপড় জড়াইয়া মজুরী করে ও ঝুড়ী বহে। প্রাতে মিউনিসিপ্যালিটীর নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা রাস্তা ঝাঁট দিয়া থাকে।

(বাঙ্গালা দেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা এদেশের লোকেরা নিঃসন্দেহ অধিকতর সৎ। এখানে চোর জুয়াচোর অতি কম। এখানকার বাটীগুলি যেরূপ অরক্ষিত এবং রাত্রে পথে আলোকের অভাবে অন্ধকার-হেতু চতুর্দ্দিকে লুকাইবার ও পলাইবার যেরূপ সুবিধা, তাহাতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় দুর্দ্দান্ত লোকেরা এখানে থাকিলে ভয়ানক কাণ্ড হইত। আমার প্রথম বৎসরের বাটীর গৃহগুলির দরজা ভাল বন্ধ করিতে পারা যাইত না ; এ বিষয়ে বাড়ীওয়ালাকে জানানয় তিনি বলিলেন, দিবসের কথা দূরে থাকুক, আপনারা রাত্রিতে বাটীর সমস্ত দরজা খুলিয়া

নিদ্রা যাইতে অথবা যেথানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারেন, কোন ভয় নাই। পর্ব্বাদি উপলক্ষে রাস্তায় জনতা হইলে পুলিস দ্বারা শান্তি রক্ষা করিতে হয় না, এবং সে দিবস অন্য দিন অপেক্ষা পুলিশের আধিক্য দৃষ্ট হয় না, অথচ পথে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় না। স্ত্রীলোক ও বালিকারা গহনা পরিয়া ভিড়ের মধ্যে অবাধে বিচরণ করে, কেহ তাহাদের গহনা কাড়িয়া বা কাটিয়া লয় না। পথে ভদ্র বংশের যুবতী রমণী চলিলে কেহ এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে না বা তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে না। লোকেরা সাধারণতঃ শিষ্ট ও সদালাপী এবং বাঙ্গালীদের প্রতি অতি ভদ্র ব্যবহার ও সম্মান করিয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের মত অল্প বয়সে ও পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের মত কিছু অধিক বয়সে বিবাহ, উভয় প্রকারই এখানে হইয়া থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বালিকারা স্বামী-গৃহে যাইতে হয় না। কয়েক নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থলে বিবাহ প্রচলিত আছে, যথা পিসীর কন্যা ও মাতুল কন্যা বিবাহ। কিন্তু ইহাপেক্ষাও এক অতি নিন্দিত ঘৃণিত বিবাহ-প্রথা আছে—পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—তাহা আপন ভগ্নীর কন্যাকে বিবাহ অর্থাৎ মামা-ভাগ্নীর বিবাহ। ব্রাহ্মণ হইতে সকল শ্রেণীর মধ্যেই এই জঘন্য প্রথা আছে। বোধ হয়, শিক্ষা-বৃদ্ধির সহিত এই সকল গর্হিত কাণ্ড শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। পিতৃব্য-কন্যা (খুড়তত ও জ্যাটতুত ভগ্নী) ও মাসীর কন্যার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। বহু বিবাহ প্রথা নাই। বিধবা-বিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ, কিন্তু এক্ষণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এ প্রদেশেও ক্রমে উহা অল্প অল্প প্রচলিত হইতেছে।

ছেত্রী ও শূদ্রেরা মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া নব বস্ত্র পরাইয়া পুষ্পাদি দ্বারা সাজাইয়া বাদ্য ও সমারোহের সহিত পথ দিয়া লইয়া যায়।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেবল শৈবেরা ঐরূপ করে, অন্যান্য ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যেরা করে না। চারি বর্ণেরই অশৌচের কাল ১২ দিবস ও পর দিবসে শ্রাদ্ধ। তাহার পর এক বৎসর কাল প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহার পর প্রতি বৎসরে একবার মাত্র শ্রাদ্ধ। কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে অশৌচের কাল ১৫ দিন, তাহার পর এক বৎসর কাল প্রতি পক্ষ অর্থাৎ মাসে দুই বার করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পরে অন্যান্যের মত প্রতি বৎসরে একবার শ্রাদ্ধ। জেলে প্রভৃতি অতি দরিদ্র ও নীচ কয়েক শ্রেণীর মৃতাশৌচ তিন দিন মাত্র এবং তাহার পর শ্রাদ্ধ।

বাদ্যের বড়ই প্রচলন। সামাজিক কার্য্যে রমণীরা নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছে, অগ্রে বাদ্য চলিয়াছে; পূজক ব্রাহ্মণ মন্দিরে পূজাদির জন্য সাধারণের নিকট অর্থ সংগ্রহে বাহির হইয়াছে, সঙ্গে বাদ্য। এমন কি, থিয়েটর বায়স্কোপ প্রভৃতির হ্যাণ্ডবিল বিলির জন্য বাঁশী ও ঢাক চলিয়া থাকে।

রমণী।

(১৯)

ইতিহাসের প্রমাণে দেখা যায়, অবরোধ প্রথার প্রধান মূল মুশলমান আধিপত্য বা প্রাধান্য ; উহারই জন্য বাঙ্গালা দেশে ও ভারতের উত্তর-প্রদেশ সমূহে অবরোধ প্রথা চলিত। মহারাষ্ট্র দেশের ন্যায় এ প্রদেশে মুশলমানের প্রাধান্য হয় নাই, এ কারণে এখানে অবরোধ প্রথা নাই, এবং তাহার ফল স্বরূপ এখানকার বাটীগুলি সাধারণতঃ এক-মহল রূপে নির্ম্মিত। কোনও বাটীতে স্বতন্ত্র অন্তঃপুর নাই। এ সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে ১৩ম বা "স্থানের আরও কথা" প্রবন্ধেও (৫২ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি।

আবার অবগুণ্ঠন প্রথার প্রধান মূল অবরোধ প্রথা, কারণ অন্তঃপুর-নিবদ্ধা নারীকে বাহিরে আসিতে হইলে লোক-চক্ষু হইতে অন্তরালের জন্য অবগুণ্ঠনাবৃতা হইতে হইতে হয়। সুতরাং এ প্রদেশে অবরোধ প্রথা না থাকায় তাহার আনুষঙ্গিক অবগুণ্ঠন প্রথাও নাই। রমণী মাত্র উন্মুক্ত মস্তকে থাকে ও সেই ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। তবে ভদ্র

নারীরা বোম্বাইএর পার্শী রমণীদের ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়ান না। রাস্তায় হাঁটিয়া চলাতেই তাঁহারা মানহানি বোধ করেন, কিন্তু গাড়ি চড়িয়া উহার চতুর্দ্দিক খুলিয়া উন্মুক্ত মস্তকে স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। বিবাহিতা যুবতীদের ঘরে বাহিরে স্বামী ও গুরু জনের সম্মুখে মস্তকে কাপড় দিতে হয় না, এ কারণে নববিবাহিতা বালিকার পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে গিয়া কোন কষ্ট হয় না। আমাদের দেশে ঐরূপ আচার নহে এই বলিয়াই উহাকে নিন্দা করিবেন না, বরং আমাদের দেশের অবরোধ ও অবগুণ্ঠন অপেক্ষা উহা যে সমাজের পক্ষে ভাল, ইহা আমি সময়ান্তরে প্রমাণের চেষ্টা করিব। ভদ্রলোকের বাটীতে নাচ গান হইলে, বাটীর ও নিমন্ত্রিত রমণীরা সুসজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করে, এবং পরিচিত অপরিচিত সমুদয় পুরুষেরা পার্শ্বেই অন্যান্য স্থানে বসে।

অবরোধ প্রথা নাই, বাহিরে আসিতে হয়, এজন্য এখানকার মহিলা-দিগের বেশ ও সজ্জাও তদনুরূপ। ইহাদের পরিধানের বস্ত্র ১২।১৩ হাত বা তদধিক দীর্ঘ ও স্থূল, এবং বাঙ্গালা দেশের রমণীদের পাতলা কাপড়ের মত কেবল দেহের বস্ত্রহীনতা দোষ খণ্ডন করে না, প্রকৃতই দেহ সম্পূর্ণ আবরণ করিয়া রাখে। সাধারণতঃ এদেশীয় মহিলারা লজ্জা-শীলা। কখন কোন অতি দরিদ্রা ও বয়স্কা রমণীরও উন্মুক্ত বক্ষ দেখি নাই। তদ্ব্যতীত যুবতী মাত্রেরই, দরিদ্রা হইলেও, বক্ষে শলুকা থাকে। পরিহিত বস্ত্র ও শলুকা কোন না কোন বর্ণে রঞ্জিত থাকে। বড় ঘরের রমণীরা, অথবা যাঁহারা বড়ত্ব দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা, জড়ি-পাড় ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট শুভ্র কাপড়ে কাচা দিয়া পরেন ভারতের দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে এই রীতি আছে। রমণীরা সুকেশিনী, কিন্তু কেশে সাধারণেতঃ খোপা বাঁধিবার রীতি নাই, চুল একত্রে করিয়া স্কন্ধের দক্ষিণ দিকে গুঁজিয়া রাখে, কলিকাতায় মান্দ্রাজী

আমাদিগকে দেখিলে উহা বুঝিতে পারা যায়। কোন কোন কামিনী আজকাল ছোট ছোট খোঁপা করে। বালিকারা বেণী করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখে।

আপাদমস্তক অলঙ্কার ধারণে এ প্রদেশীয়ারা বঙ্গীয়াদিগের পশ্চাতে নহে। অবস্থা ভাল হইলে মস্তকের মধ্যদেশে চুলের উপর এক বৃহৎ গোল স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া থাকে, ইহা বঙ্গ দেশে নাই। কাণে কতকগুলি ছিদ্রে মাকড়ী, ফুল, ঝুমকা প্রভৃতি আশ্রয় পায়। কিন্তু এক বীভৎস কাণ্ডে মুখের শোভা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। বাঙ্গালা দেশে বালিকারা নাসিকায় নোলক পরে, পরে ১৫।১৬ বৎসর বয়স হইলে বা পুত্রের মাতা হইলে তাহা পরিত্যাগ করে; মুশলমান মহিলারা সকল বয়সেই নোলক পরে। নোলক পরিত্যাগের পর সেকালের রমণীরা নত পরিত, একালেও কেহ কেহ পরে। যাহা হউক, অল্প বয়সে নোলক চলিলেও তাহার পরে নত পরিয়া যুবতী রমণীর মুখে কি ঘৃণ্য অশোভা হয়, কি বিশ্রী দেখায়, তাহা সৌন্দর্য্য-বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্র অনুভব করেন, একারণে এই নত ধারণ এক্ষণে বহু পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজকালও এমন সেকেলে রুচিবিশিষ্ট পুরুষ ও রমণী দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা এই নতকেও আদর করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এ প্রদেশের কাণ্ড আরও বীভৎস। বাঙ্গালা দেশে সাধারণতঃ নাসিকার কেবল এক ছিদ্র প্রচলিত; তৎস্থলে এ দেশে বালিকা কাল হইতে তিন ছিদ্র করা হইয়া থাকে, এবং অনেকে তিনটী ছিদ্রেই মাকড়ী নোলক বা নতের মত তিনটী পদার্থ, অন্ততঃ একটী ত সকলে, পরিবেই। মোট বহিয়া খায়, এমন কুলী রমণীর নাকে নোলক বা স্থূল মাকড়ী দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুখের বিষয়—এক্ষণে ক্রমে ভদ্র রমণীরা এ প্রথা পরিত্যাগ করিতে-ছেন, তাঁহারা এক বা দুই ছোট নাক-চাবি ধরিয়াছেন। হাতে

কারুকার্য্য-হীন বালা প্রভৃতি থাকে। আমাদের দেশের গোট চন্দ্রহার প্রভৃতির স্থলে এখানে সচ্ছল অবস্থার রমণীদের কোমরে স্বর্ণের বেল্ট বা পেটি থাকে। প্রতি পদে অন্ততঃ দুই গাছা মল থাকে, কিন্তু আমাদের দেশের সুন্দরীদের মলের মত এদেশের মলে কোন সৌন্দর্য্য বা মধুর শব্দ নাই, উহাদের চেপ্টা আকার এবং পদের চতুর্দ্দিকে আঁটিয়া লাগিয়া থাকে, আদৌ বাজে না ও নড়ে না।

মিসেস এ হোষেণ নাম্নী এক বিদুষী মুশলমান মহিলা লিখিয়াছেন; আদিম কালে মনুষ্যেরা রমণীদিগকে গরু ছাগল প্রভৃতির ন্যায় বোধ করিত এবং তাহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিত। সেই কালে গোরুর মত নাকে ও কাণে ফুড়িয়া এবং হাত ও পায়ে লৌহ বেষ্টন দিয়া রমণীদিগকে যে বাঁধা হইত, বর্ত্তমান অলঙ্কার ধারণ প্রণালী তাহা হইতেই উদ্ভূত, এবং তাঁহারই এক কালীন অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। বাস্তবিক ভারতের অনেক স্থানের ও এ প্রদেশের অলঙ্কার দেখিলে ঐ অনুমান অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না।

রমণীদের গঠন—বিশেষতঃ মুখ ও চক্ষুর গঠন—সাধারণতঃ মন্দ নহে, এবং ভারতের আর্য্য বংশীয় অন্যান্য জাতির রমণী হইতে বিভিন্ন নহে। বাঙ্গালা দেশের স্ত্রীলোকদিগের মৌখিক অভিধানে "শ্যাম" বর্ণের অর্থ অতি বিস্তৃত, উহাতে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ হইতে অর্দ্ধ কৃষ্ণ বা অর্দ্ধ "ফর্‌সা" বর্ণ পর্য্যন্ত বুঝায়। ঐ অর্থে এদেশের রমণীদের বর্ণ শ্যাম, তবে বাঙ্গালা দেশের মত এখানেও অনেক সুন্দরী অর্থাৎ "ফর্‌সা" বর্ণা দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীরা সাধারণতঃ পরিশ্রমী শিষ্টা হাস্যমুখী ও আমোদপ্রিয়া। যুবতী দুঃখিনীরাও মস্তকে কাষ্ঠের বোঝা লইয়া মৃদু হাস্যালাপ করিতে করিতে পথে চলে। কলিকাতার পথে আমার বাইসিকলের সম্মুখে কোন স্ত্রীলোক পড়িলে যদি বংশী বা ঘণ্টা-ধ্বনি

করি, তবে সে বিরক্ত ভাবে ও বকিতে বকিতে এক পার্শ্বে সরে, কেহ কেহ গালি দেয়, আবার কোন কোন বৃদ্ধা যমের বাটী যাইতে পর্য্যন্ত অনুমতি করে। কিন্তু এখানে বংশী বা ঘন্টা-ধ্বনি করিলে রমণীরা সহাস্য মুখে পথ ছাড়িয়া দেয়। স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমী, দরিদ্র পরিবারের বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেই জাঁতার ময়দা ভাঙ্গা, দূর হইতে কলস দ্বারা জল আনা, মোট বহা, প্রভৃতি সকল পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য করে। কলিকাতার হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে কতিপয় উড়ে মুটে ব্যতীত অন্য কোন মুটে—দীর্ঘকায় বলবান্ মুশলমান মুটেরাও—এক মণের অধিক মাল বহন করিতে চাহে না। কিন্তু এখানে দেখিলাম, কুলী রমণীরা অবলীলাক্রমে দুই মণ চাউলের বস্তা মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছে।

বিধবাদের, বিশেষতঃ ভদ্র বংশের বিধবাদের, দেখিতে ঠিক বাঙ্গালী বিধবাদের মত, এবং পথে উহাদিগকে দেখিয়া আমার অনেক সময় বাঙ্গালী রমণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে। ইহারা পাড়হীন সাদা কাপড় ঠিক বাঙ্গালী ধরণে পরে অর্থাৎ বক্ষের দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিক দিয়া বাম স্কন্ধের উপর লইয়া যায়। ইহারা মস্তক কেশ-হীন করিয়া সতত কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। একাদশীতে উপবাস করে, তবে তাহা বঙ্গ দেশে রঘুনন্দন-প্রবর্ত্তিত নির্জ্জল নহে। এ স্থানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এক বঙ্গ দেশ ব্যতীত—তাহাও সমস্ত বঙ্গ দেশে নহে, বঙ্গ দেশের মধ্যবর্ত্তী কতক অংশে ও কেবল উচ্চ জাতিদের মধ্যে—ভারতের কোথাও বিধবাদের মধ্যে নিষ্ঠুর নিরম্বু একাদশী প্রথা নাই। সেই দিন কেবল অন্নাহারই বন্ধ থাকে। এদেশে বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত, তবে এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহা প্রচলনে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা এক্ষণে প্রচলিত হইলেও বহু ব্যাপ্ত হয় নাই।

অত্রত্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে, এক জঘন্য প্রথা আছে—উহা চুরুট খাওয়া। স্ত্রী পুরুষ শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চুরুটের দাস, মুখে চুরুট লাগিয়াই আছে। কিন্তু সুখের বিষয়, ভদ্র পরিবারের রমণীদের ঐ দোষ নাই।

কলিকাতার বাইজীর মত এখানে নৃত্যগীতকারিণী আছে। কলিকাতার বাইএর দলে একটী মাত্র রমণী নৃত্য-গীত করে, কিন্তু এখানে প্রতি দলে ৪টী নারী থাকে, উহাদের মধ্যে এক জন নৃত্য-গীত করে, অপর তিন জন পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উহার গানের সাহায্য করে বা উহার সহিত গান করে এবং শব্দহীন এক প্রকার মন্দিরা দ্বারা তাল রাখে। প্রতি দলে দুই জন পুরুষ বেহালা ও এক জন ছোট পাখোয়াজের মত ঢোলক বাজায়। গানের কথা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সুরগুলি ঠিক বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত মত। শিক্ষায় এখানকার গায়িকারা বাই অপেক্ষা অনেক নিম্নে, তবে উহাদের গান শুনিতে মন্দ লাগে না। প্রতি দলের পারিশ্রমিক ১০৲ টাকা।

পর্ব্ব।
(২০)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে শিব-দুর্গা রাম-সীতা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতার মন্দির আছে, এবং তথায় সম্বৎসর পূজাদি হয়। স্বতন্ত্র প্রতিমা গড়িয়া পূজা ও পূজান্তে প্রতিমার বিসর্জ্জন প্রণালী এদেশে নাই। এখানে কেন, এক বঙ্গ দেশ ব্যতীত ভারতের আর কোথাও নাই, এবং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও ঐ প্রণালীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন এবং তদবধি বঙ্গ দেশে উহা চলিতেছে ও উহার অনুরূপ পূজা পদ্ধতি সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে।

বঙ্গ দেশের ন্যায় এখানে শরৎ কালে দুর্গোৎসব হয় না। এখানে কালী-পূজাকে দশহরা বলে, এবং তৎকালে দীপালোক প্রভৃতি করা হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত রথ-যাত্রা প্রভৃতি অনেক ছোট ছোট পর্ব্ব আছে।

এখানকার সর্ব্ব-প্রধান পর্ব্বের নাম পঙ্গল। ইহার অপর নাম পেদ্দা পন্‌ডুগা, অর্থ — প্রধান উৎসব। বাঙ্গালীদের নিকট যেমন শারদীয়া দুর্গা-পূজা, মুশলমানদের নিকট যেমন মহরম, এখানকার লোকদিগের নিকট তেমনই পঙ্গল। পৌষ মাসের প্রথম হইতে প্রতি দিবস প্রতি বাটীর

দ্বারে ও সম্মুখের রাস্তায় আলিপনা দৃষ্ট হয়। ইহা মঙ্গলের আগমনের সূচনা। মাসের শেষ ভাগে ধনী দরিদ্র সকলের বাটী পরিষ্কার ও চুণকাম করা হয়। সমস্ত পৌষ মাস সন্ধ্যার পর ও প্রত্যূষে অধিকাংশ মন্দিরে নহবৎ বা রুশনচৌকী বাজিয়া থাকে।* পৌষ মাসের শেষ দুই দিন এবং মাঘ মাসের প্রথম দুই দিন, এই চারি দিন ব্যাপিয়া এই উৎসব হয়। ঐ কয় দিন এখানকার আফিস আদালত স্কুল প্রভৃতি সকল বন্ধ থাকে। প্রথম দিন অত্রত্য লোকেরা উত্তমরূপে মস্তক পরিষ্কার ও স্নান করে এবং নিরামিষ ভোজন পূর্ব্বক সংযম করে। দ্বিতীয় দিবসে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তি দিনে কেবল মস্তক ধৌত করিয়া মৃত পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করে। এই কার্য্যে অনেক বেলা হয় এবং তাহার পর ভোজনাদি হয়। পিণ্ডদানের সহিত পূর্ব্বপুরুষদের নিকট নূতন জামা কাপড় শাড়ী প্রভৃতি উৎসৃষ্ট হয়, এবং তাহা পরে পরিবারের ব্যবহারে আসে। শিল্পীরা তাহাদের যন্ত্রাদির পূজা করে, এবং গাড়োয়ানেরা তাহাদের গাড়ীর চাকার চতুর্দ্দিক লাল সাদা ফোঁটা দ্বারা শোভিত করে। শেষ দুই দিন, অর্থাৎ মাঘ মাসের ১লা ও ২রা, কেবল আমোদ প্রমোদ, বেশ ভূষা, খাওয়ান ও নিমন্ত্রণ-রক্ষা। বালক বালিকা যুবতী নব নব বিচিত্র বসন ও অলঙ্কার দ্বারা শোভিত হয়। সুন্দরীরা (অবশ্য তৎসহিত অসুন্দরীরাও) হরিদ্রা মাখিয়া রূপ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। (উড়িষ্যা হইতে ভারতের দক্ষিণ পর্য্যন্ত রমণীদের মধ্যে শুভ কর্ম্মে হরিদ্রা মাখা প্রচলিত।) কন্যারা শ্বশুরালয় হইতে পিতৃ-গৃহে আসে। অবস্থানুসারে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ ও মহা আমোদ প্রমোদে উৎসবের কয় দিন অতিবাহিত হয়।

---

* কাশীর নহবত ও রুশনচৌকী অতীব মিষ্ট ও মনোহর। এখানকার ঐ বাজনা কাশীর তুলনায় কিছুই না হইলেও কলিকাতার অপেক্ষা মিষ্ট বলিয়া আমার বোধ হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তি দিবসে সহরের রাস্তায় গান বাজনা, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর সহিত অভিনয় প্রভৃতি নানা রূপ আমোদ হইয়া থাকে, এবং তাহাতে বিলক্ষণ জনতা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দিন অর্থাৎ ১লা ও ২রা মাঘে অনেক বালক ও যুবা সুসজ্জিত হইয়া ভ্যালি গার্ডেনে (১৪শ প্রবন্ধ দেখুন) আমোদ করিতে যায়। শেষ দিন অর্থাৎ ২রা মাঘ সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সুসজ্জিত হইয়া পদব্রজে ও গাড়ীতে ব্যাঙ্কটেশ্বর পাহাড়ে (১৩শ অধ্যায় দেখুন) যায়। সহরের সমস্ত মন্দির ও আড্ডা হইতে দলে দলে লোক ধ্বজা পতাকা তুলিয়া যন্ত্রসংযোগে গান করিতে করিতে এখানে আসে। কোন কোন দলের সমুদয় লোকের গাত্র অনাবৃত ও চন্দন-চর্চ্চিত থাকে। প্রায় প্রতি দলের সহিত এক একটী সুবৃহৎ পিতলের প্রদীপের ঝাড় থাকে। ইহা এত বড় যে, বাঁশে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দুই ব্যক্তি তাহা স্কন্ধে করিয়া বহন করে। পাহাড়ের উপরে গিয়াও গান হয় এবং সন্ধ্যার পর তথায় ঐ প্রদীপের ঝাড়গুলি জ্বালা হয়। পাহাড়ের নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত বহু দল রুশনচৌকি, নহবৎ, ও অন্যান্য মধুর বাজনা বাজিতে থাকে। বাঙ্গালা দেশের বীভৎস ঢুলীর বাদ্য এদেশে নাই। দুই ধারে অসংখ্য দোকান বসে। বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিন যে পাহাড় এক রূপ জনহীন থাকে, আজ তাহাতে এত স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকার ভিড় হয় যে, গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি করিয়া উঠিতে হয়; তথাপি মারামারী, দাঙ্গা, পকেটমারা, অলঙ্কারধারিণী বালিকা ও রমণীর অলঙ্কার ছিনাইয়া লওয়া—এসকল কিছুই হয় না। পুলিশ সামান্য দুই চারি জন মাত্র থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে কিছুই করিতে হয় না। সকলেই, মন্দিরস্থ বিগ্রহ দর্শনের পর, চারি দিকে বসিয়া, আমোদ আহ্লাদ করে এবং অপরাহ্ণ হইলে ক্রমে ক্রমে ফিরিতে থাকে, কিন্তু মেলা রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ে যে সকল

বাঙ্গালী এখানে আসেন, তাঁহারা যেন ২রা মাঘ স্মরণ রাখিয়া এই দৃশ্য দেখেন।

এদেশের আদিম ভাষায় কালীকে পলমা বলে। কোন কোন বৎসর চাঁদা তুলিয়া—কালীপূজা হয় কিনা জানি না, কিন্তু তদুপলক্ষে—Procession বা শোভা-যাত্রা বাহির হয়। নবদ্বীপের বিখ্যাত পট-প্রতিমার মত, কিন্তু তত বড় না হইলেও, কাগজে প্রস্তুত ও সুরঞ্জিত এক বৃহৎ প্রতিমা বাহির হয়। উহাতে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠিত থাকে। বহু বাহকেরা স্কন্ধে করিয়া প্রতিমা বহন করে; উল্‌টাইয়া পড়িবার ভয়ে, মুশলমানদের দোম্-দাদারের মত, প্রতিমার দীর্ঘ দড়ী বাঁধিয়া চারি দিকে লোকে ধরিয়া থাকে। অগ্রে অনেক গান ও কীর্ত্তনের দল চলে, এবং বহু হাঁটা সং, গাড়ীতে চড়া জিম্‌নাষ্টিকের দল, ইত্যাদি নানারূপ বাহির হয়।

মহরম মুশলমানদের উৎসব হইলেও উহাকে এখানকার হিন্দুদের পর্ব্বও বলা যাইতে পারে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা উহাতে মুশলমান অপেক্ষা অধিক মাতিয়া থাকে। পঞ্জা বাহির হইলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু রমণীরা উহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করে, উহার চতুর্দ্দিকে (খৈ'র অভাবে) চাল-ভাজা ও চিড়া ভাজা ছড়াইতে থাকে, এবং যেখানে তাজিয়া বিসর্জ্জন হয়, তথাকার জল গঙ্গা-জলের মত আপনাদের গাত্রে ছিটায়। অনেক হিন্দু গাত্রে নানা চিত্র-বিচিত্র করিয়া মস্তকে বিকৃত মুখস পরিয়া অপরূপ বেশে সং সাজে, এবং হাঁটা ও গাড়ীর অসংখ্য সং কয় দিন-যাবৎ বাজনার সহিত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়ায়। সংএর বৈচিত্র্যও আছে। যথা—চোরের কোমরে দড়ী বাঁধিয়া পাহারাওয়ালা লইয়া যাইতেছে, চোরকে চোরাই মাল বাহির করিয়া দিতে বলিতেছে, চোর রাস্তায় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে উপযুক্ত লোক বিবেচনায় দেখাইতেছে, তখন সেই ব্যক্তির

দুই এক পয়সা দান করিয়া তবে নিস্তার পাইতে হয়। রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে, আমার বাটীর সম্মুখে একযোগে ক্রন্দন হাস্য ও শঙ্খের রব উঠিল। বাহির হইয়া দেখি, দ্বারে খাটে মড়া, জীবন্ত মড়া মাঝে মাঝে চক্ষু মিট্‌মিট করিতেছে। সহচরদের মধ্যে কেহ কাঁদিতেছে, কেহ উচ্চ হাসিতেছে, কেহ বা শাঁখ বাজাইতেছে। দলকে কিছু দিয়া বিদায় করিতে হইল। অনেক সংএর সর্ব্বাঙ্গে রীতিমত painting বা রং ও তুলিসহযোগে চিত্র করা হয়। এইরূপে মানুষ-ভালুক ও মানুষ বাঘ সং খাঁচায় পুরিয়া বাহির করা হয়। গাড়ীতে করিয়া জিম্‌নাষ্টিক দল বাহির হয়, সমস্ত পথে জিমনাষ্টিক করিতে থাকে। সহরের সর্ব্বত্র নহবত, রুশনচৌকী, ও ঢাকের বাদ্যে কয় দিন কাণের পোকা বাহির হইয়া যায়। বহু নিশান, কাগজের লণ্ঠনের মালা, সং, লাঠী খেলা (প্রধানতঃ হিন্দুদিগদ্বারা), প্রভৃতির সহিত দলে দলে লোক রাস্তায় বাহির হয়, এবং (১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত) মুশলমান শৈলের নিকট গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। শেষ অর্থাৎ "মাটির" পূর্ব্ব দিন সমস্ত রাত্রি যাবৎ রাস্তায় রাস্তায় ঐ আমোদ চলে। মহরম মুশলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের এক মহৎ শোকের কাহিনী, কিন্তু এখানে মুশলমানেরা হিন্দুর সহযোগে উহা কেবল আমোদ আহ্লাদ রঙ্গ-রসের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য আমাদের মত দর্শকদের পক্ষে এখানকার মহরম-কাণ্ড বেশ দেখিবার বস্তু। আপন দেবদেবীদিগের নিকট মানার ন্যায় এখানকার অনেক হিন্দু ঐ মুশলমান শৈলে কবরিত মুশলমান পীরের নিকট ফল মিষ্টান্ন পয়সা প্রভৃতি মানত করিয়া থাকে, এবং এই মহরমের সময় তথাকার দরগায় সিন্নী দিয়া আসে।

এখানকার তাজিয়াগুলি কলিকাতার তাজিয়া অপেক্ষা বড় নহে বটে, কিন্তু অতি সুন্দর ও দেখিবার দ্রব্য। বিশেষ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সহিত বহু পরিশ্রমে উহা নির্ম্মিত হয়, এবং বোধ হয় সেই কারণে 'মাটির' দিনে

কলিকাতার মত উহা নষ্ট না করিয়া, সহর প্রদক্ষিণ করাইয়া পুনরায় স্ব স্ব স্থানে আনিয়া রাখা হয়। সৌন্দর্য্যের জন্য অনেক সাহেব বিবি গাড়ী করিয়া কয় দিন তাজিয়া দেখিয়া দেখিয়া বেড়ায়। আমার বাটীর কিছু দূরে রাস্তার উপরে চালা বাঁধিয়া তাহার ভিতরে একটী তাজিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। কাগজের বিচিত্র কারুকার্য্য ব্যতীত ইহাতে অতি সুন্দর মমের ফুলের কার্য্য ছিল, এবং নিকটে একটী কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে জলধারা দুই তিন হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল। তাজিয়ার সম্মুখে নিম্ন দেশে দুইটী নর-মূর্ত্তি ছিল, একটী এতদ্দেশীয় হিন্দু রমণীর, অপরটী—পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন —কপালে ফোঁটা-কাটা হিন্দু ব্রাহ্মণের। মুশলমানের মহরমের সহিত এখানকার হিন্দুরা কিরূপ সংশ্লিষ্ট, তাহা দেখুন।

এই মহরমের সহিত জড়িত একটী আশ্চর্য্য উৎসবের বিবরণ স্বতন্ত্র বিশেষ ভাবে বর্ণনার যোগ্য। বহুকাল হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দর্শক সাহেবদের বর্ণনায় ভারতের কোন কোন স্থানে আশ্চর্য্য অগ্নি-পরিক্রম (অগ্নিরাশির উপর রিক্ত পদে বেড়ান) ব্যাপার শুনিয়া আসিতেছি। এখানে আমার উহার প্রত্যক্ষ-দর্শন লাভ হইয়াছে। কোন কোন বৎসর "মাটির" পূর্ব্ব দিনের রাত্রিতে এই উৎসব হয়, এবং কেবল এক স্থানে এক দলের দ্বারা নহে, অনেক দলের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিষ্পন্ন হয়। আমার বাটী হইতে সামান্য দূরে এক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু গৃহস্থের বাস। মহরম উপলক্ষে এ ব্যক্তি তাহার বাটীর প্রাঙ্গণে ছোট চালা বাঁধিয়া "পঞ্জা" বসাইয়াছিল। হিন্দুর বাটীতে মুসলমানের পঞ্জা পূজা—শুনিতে কেমন বোধ হয়? অনেক মুশলমান উহার পৌরহিত্য করিত। ঘটনার স্থলে সন্ধ্যার সময় যাইয়া দেখিলাম, ৬-৭ হাত দীর্ঘ ২-২॥ হাত প্রশস্ত ও ১-১। হাত গভীর একটী খাদ বা গর্ত্ত কাটা হইয়াছে, এবং পার্শ্বে রাশি পরিমাণ জ্বালানী কাষ্ঠ রহিয়াছে। গর্ত্তের ভিতর পূর্ণরূপে ঐ কাষ্ঠ দিয়া তাহা জ্বালান হইতে লাগিল। ক্রমাগত

দুই ঘন্টা কাল জ্বালাইবার পর সমুদয় কাষ্ঠ নিঃশেষ হইলে দেখা গেল, গর্ত্তটী জ্বলন্ত লাল কয়লার আগুনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন এক ব্যক্তি লাঠী বা চেরা বাঁশ দ্বারা ঐ কয়লার আগুন গর্ত্তের উপর সর্ব্বত্র সমান করিয়া বিছাইয়া দিল। এদিকে উপরোক্ত পঞ্জার মুশলমান পুরোহিত চারিটী হিন্দু বালককে সমুদ্রে স্নান করাইয়া রাখিয়াছিল। বয়স ১০ হইতে ১৪। উহারা পঞ্জার নিকট বসিয়াছিল, পুরোহিতের সঙ্কেতে বাহির হইল। পুরোহিত আমার অবোধ্য কি বলিতে লাগিল, অমনই বালকেরা তাহা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নির উপর রিক্ত পদে দ্রুত গতিতে বার বার যাওয়া আসা করিতে লাগিল। এক জনের পশ্চাতে অপর, এইরূপ শ্রেণীবদ্ধরূপে বালকেরা অগ্নি-ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যের এক দিক হইতে অপর দিকে পার হইয়া কিয়দ্দূর মৃত্তিকার উপর হাঁটিল, আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় অগ্নি-ক্ষেত্র পার হইয়া পূর্ব্ব দিকের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকার উপর হাঁটিল। গর্ত্তস্থ অগ্নির উত্তাপে আমার ও অন্য সকলের দূর হইতে অত্যন্ত কষ্ট-বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু বালকেরা অবলীলাক্রমে ৬ হাত দীর্ঘ অগ্নি-ক্ষেত্রের উপর উপরোক্তরূপ বিচরণ করিতে লাগিল, তাহাদের পদে বা মুখে কোনরূপ যন্ত্রণার চিহ্ন দেখিলাম না। এইরূপ অনেক বার পরিক্রমের পর, তাহারা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বাদ্য-ভাণ্ডের সহিত মুশলমান শৈলের দরগার দিকে গেল এবং সমস্ত রাত্রি আমোদে পথে পথে অতিবাহিত করিয়া পরদিন সকালে ফিরিল। এইরূপ অগ্নি-পরিক্রমে কেন যে পা পুড়ে না, তাহা বুঝা যায় না। ইহা এক আশ্চর্য্য দৃশ্য!

গ্রহণ, বিশেষ বিশেষ তিথি, যথা মাঘী পূর্ণিমা, ইত্যাদি উপলক্ষে সমুদ্র-তীরে স্নানের পর্ব্ব হয়। তীরের উপরের রাস্তা ধনীদিগের গাড়ীতে পূর্ণ হইয়া যায় এবং ধনী নির্ধন সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত অসংখ্য নরনারীতে

সমুদ্র মুখরিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৮শ বা "অধিবাসী" প্রবন্ধে বলিয়াছি, পর্ব্ব ব্যতীত এখানকার লোকেরা সমুদ্রে স্নান করে না।

আমার এখানে প্রথম বৎসরের অবস্থিতি কালে বিখ্যাত অর্দ্ধোদয় যোগ (১৯এ মাঘ ১৩১৪, ইং ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯০৮, রবিবার) হয়। অন্য দিন যে সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাস্তায় আদৌ জনতা থাকে না, এবং যে সমুদ্র-তীরে জেলেরা ব্যতীত প্রায় অন্য কোন মনুষ্য দেখা যায় না, ঐ যোগের দিনে তথায় তাহার একবারে সম্পূর্ণ রূপান্তর হইয়াছিল। পাঠক, ৯ম বা "স্নান" প্রবন্ধে বর্ণিত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী রাস্তা এবং তদুপরিস্থ টাউন হল ও শিব-মন্দির স্মরণ করুন। প্রত্যূষে ৪টার সময় হইতে স্নান আরম্ভ হইয়াছিল। আমি বাইসিকল-যোগে প্রাতে ৭টার সময় ঐ রাস্তার দক্ষিণ হইতে উত্তর মুখে বাহির হইলাম। প্রথম হইতে অল্প অল্প ভিড়, পরে টাউন হল হইতে বিশেষ ভিড় আরম্ভ হইল। এই স্থান হইতে যতদূর চক্ষু চলিল, ততদূর দেখিলাম, এই সুদীর্ঘ রাস্তা লোকে ও গাড়িতে পরিপূর্ণ এবং পথের এক ধারে কাপড় পাতিয়া ভিক্ষুকের অন্তহীন শ্রেণী বসিয়া গিয়াছে। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়ার পর জন-স্রোতে বাইসিকল চালাইবার পথ পাইলাম না। উহা হস্তে ধরিয়া টানিয়া পদব্রজে চলিলাম। ক্ষণমধ্যে এত গাঢ়ীর অরণ্য মধ্যে পড়িলাম যে, বাইসিকল ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে তাহা পথের ধারে এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া ছাড়িয়া যাইতে হইল। কিন্তু আর কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে আর পায়ে চলিবারও পথ পাইলাম না। তখন পথপার্শ্বস্থ জল-নালীতে (তাহা শুষ্ক ছিল) নামিয়া চলিতে হইল। কিরূপ ভিড় হইয়াছিল, তাহা পাঠক ইহাতে অনুমান করুন।

ভিজাগাপত্তনের বহু দূর স্থান সকল হইতে অসংখ্য লোক স্নানে আসিয়াছিল। লোকে লোকে ও তাহাদের গাড়ীতে সমস্ত স্থানে ঠাসা-

ঠাসী হইয়াছিল। জনতা সৰ্ব্বাপেক্ষা ঘন ছিল উপরোক্ত তীরস্থ শিব-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে। তথায় রাস্তা হইতে ভিড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে সমুদ্রতীরে নামিয়া দেখিলাম, সুবিস্তৃত তীরভূমিতে ও সমুদ্র-স্থলের বহুদূরে পর্য্যন্ত অংশে কেবল অসংখ্য নর-মস্তক রহিয়াছে, নিম্নের মৃত্তিকা বা জল দেখা যাইতেছে না। স্থানীয় অনেক মন্দিরের বিগ্রহ-গুলিও স্নানের জন্য সুসজ্জিত তঞ্জাম দ্বারা আনীত হইয়াছিল। তাহা-দের সমভিব্যাহারী ধ্বজা ও বাদ্যে বেলাভূমি রঞ্জিত ও মুখরিত হইয়াছিল। সঙ্গীত বাদ্য ও নরকল্লোলের সহিত সমুদ্র-কল্লোলের ঐকতান হইয়াছিল। বিশেষ আনন্দের বিষয়, এত ভিড়েও এখানে পুলিশের উৎপাত ছিল না, শত শত যুবতী অবাধে স্নান ও যাতায়াত করিতেছিল, তাহাদের কাহারও উপর উপদ্রব ছিল না, এবং চুরী মারামারীও দেখা যায় নাই। স্নানের পর তীরস্থ শিব-মন্দিরে দেব-দর্শনের পর যেমন জন-স্রোত এক দিকে চলিল, অমনই অপর দিক হইতে নব জন-স্রোত আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিল। কত বেলা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

কথা ও ভাষা।

(২১)

কোন স্থানে কিছু দিন থাকিলে তত্রত্য লোকদের কথা শিখিতে ও বুঝিতে কৌতূহল হয়। আর স্থানীয় ভৃত্যাদির সহিত কথা কহিতে ও বিশেষতঃ বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয়ে উহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তাও আছে। এই কারণে নিম্নে এখানকার চলিত কতকগুলি কথা দিলাম। ১৮শ বা "অধিবাসী" প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, এ প্রদেশের লোকেরা সম্পূর্ণ আর্য্য-রক্তোদ্ভূত নহে, এবং তাহার প্রমাণ—স্থানীয় ভাষা (তেলগু) সংস্কৃতের দুহিতা নহে, নিম্ন উদ্ধৃত কথাগুলি দেখিলেও তাহা বুঝা যায়। তবে এক্ষণে অনেক সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

সংখ্যা।

এক	...	ওকৃটী, অকৃটী
দুই	...	রেণ্ডু
তিন	...	মুড্ডু
চার	...	নালুগু
পাঁচ	...	আইদু
ছয়	...	আরু
সাত	...	এড্ডু
আট	...	এনিমিদি
নয়	...	তম্মিদি
দশ	...	পাদি
এগার	...	পাদাকুণ্ডু
বার	...	পান্নেণ্ডু
তের	...	পাদামুড্ডু
চোদ্দ	...	পাদুনালুগু, পান্নালুগু
পনের	...	পাদিএন্ডু, পাদাইদু
ষোল	...	পাদারু, পাদেনারু
সতের	...	পাদিএড্ডু, পাদাএড্ডু

আঠার ... পাদিএনিমিদি
উনিশ ... পান্দোমিদি,
পাদাতম্মিদি
কুড়ি ... এরোবাই
আধ ... আরা অর্দ্ধা

বহুবচন।

ল ... বহুবচনের চিহ্ন
কায়া—ফল, বহুবচনে কায়লু
চেপা—মাছ, বহুবচনে চেপালু
পাণ্ডু—পাকা ফল, বহুবচনে পাল্‌লু

মুদ্রা।

পাই ... দামড়ী
দুই পাই ... এগানি
আধ পয়সা কাণ্ড, মুড়্ টোলী
পয়সা ... কানী
চার পাই ... ডব্ব,
পাঁচ পাই ... ডব্ব, দামড়ী
আট পাই ... রুন্ ডব্‌লু
দুই পয়সা ... ডব্ব, নারা
আনা আনা
ছয় পয়সা ... আনা নারা,
আনা পড়্কা
দুয়ানী ... ব্যাড়া
সিকি ... পাওলা, বর্ত্তলা
আধুলী ... অর্দ্ধ রুপাই,
টাকা ... রুপাই, রূপিয়া

ফল।

কাঁচা ফল ... কায়া
পাকা ফল ... পাণ্ডু, বহুবচনে পাল্‌লু
নারিকেল ... কব্বরী কায়া
কলা (পাকাকলা) আরটী পাণ্ডু
আতা ... সীতাফলম্
পেঁপে ... বোপাই কায়া
কাঁচা আম ... মামিদি কায়া
পাকা আম মামিদি পাণ্ডু
লেবু ... নেমো পাণ্ডু
কমলা লেবু কমলা পাণ্ডু

তরকারী।

লঙ্কা কাঁচা ... মেরব কায়া
তেঁতুল পাকা ... চিন্তা পাণ্ডু
বেগুণ ... ওয়াঙ্কায়া, অঙ্কায়া
লাউ ... আনব কায়া
কুমড়া ... গুম্মাতী কায়া,
জুমূরী কায়া
শাক ... বোড়া
আলু ... বাঙ্গালী দম্পলু
কাঁচ কলা ... আরটী কায়া
পিঁয়াজ ... উল্লি কায়া
আদা ... আল্লামু

তৈল।

তৈল ... নুনী
তিলের তৈল নুনী
নারিকেল তৈল কব্বরী নুনী
কিরসিন তৈল কেঁরাসীন নুনী
রেড়ীর তৈল আইদমু

অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য।

জল ... নীলু
দুধ ... পালু
দধি ... পেরুগু
ঘৃত ... নেয়ী, নেগী
চাল ... বিয়ম্
ভাত ... অন্নম্
রুটী ... রুটী
লুচী ... পুরী
ডাল ... পপ্পু
ছোলার ডাল ছলক পপ্পু
অড়হর ডাল কান্দী পপ্পু
মুগের ডাল পেশর পপ্পু
কড়াই ডাল মেনপা পপ্পু
সাগু ... সগ্গু বিয়ম্
লবণ ... উপ্পু
হলুদ ... পসুপু
আটা ... গোধূমপিণ্ড
ময়দা ... কলকাতা গোধূম পিণ্ডি
সুজী ... গোধূম নোকা
গুড় ... বেল্লম্
চিনি ... পঞ্চদারা, পাঁচদারা
দানাওলা চিনি আস্কা পঞ্চদারা
মিশ্রী ... পটকী পঞ্চদারা
মাছ ... চেপা (বহু বচনে চেপালু)
সজীব মৎস্য বাচ্চি চেপা
চিংড়ী মাছ রইয়া, বহুবচনে রইলু
মাছের ডিম চেপাছেনা
কাঁকড়া ... পিতা, বহুবচনে পিতলু
মাংস ... মাংসম্
ডিম্ব ... গুড্ডু, বহুবচনে গুডলু
পান ... তমাল পাকু
সুপারী ... পউ চাক্কা
চুণ ... সুন্নমু
সাজা পান ... তাম্বুলম্
তামাক ... গুড়াক, গুড়াকু

জন্তু।

গরু ... আউ

বাছুর ... পেইয়া
মহিষ ... গেদ্দী
ছাগল ... মেয়েকা
বিড়াল ... পিল্লি
ঘোড়া ... গুর্‌রমু
কুকুর ... কুক্কা
মুর্‌গী ... ক্কড়ী
ইন্দুর ... এলাকা
নেংটী ইন্দুর ষুঞ্চী
বড় ইন্দুর ... পান্দি কুক্কু
পিপীলিকা সিয়ামাল্
কাক ... কাকী
মশা ... দোমালু
ছারপোকা নালি, বহুবচনে নাললু

ভৃত্য।

চাকর ... বান্টথু, নক্‌রী
ধোবা ... সাক্‌লু
নাপিত ... মঙ্গলী
মেথর ... পাকি
পাচক ব্রাহ্মণ পাস্তলু, মহারাজ

গৃহস্থালী দ্রব্য।

চৌকী ... কুর্চ্চি
টেবল ... টেবলু, মেজেবেল্লা
ল্যাম্প ... দীপম্, ল্যাম্প
মাহুর ... সাপা
বিছানা ... পাক্কা, বিছানা
গদি ... পারুপ্পু
বালিশ ... তালাগাডি, তাকিয়া
হাঁড়ী ... কুণ্ডা
কড়া ... প্যানামু, কড়াই, এনাপামুকুন্ডু
ঘটী ... চেম্বু
বাটী ... গিন্নে
ছুরী ... চাকু
দা, বড় ছুরী কাত্তি
বঁটী ... কাত্তি পেটা, (পেটা=বসা)
সূচ ... সুদি
দড়ী ... তাড়ু
ঝাঁটা ... চিপ্রু, চিব্‌রু
শিল ... শান্নিকালু, শান্নি
নোড়া ... গোড্ডা, শান্নিগোড্ডা
পাতা ... আকু, বহুবচনে আকলু
কলাপাতা ... আর্‌টী আকু
জ্বালানী কাষ্ঠ কারলু

উনান ... পৈ
আগুন ... আগ্গি, নিপ্পু
ধুতি ... বাট্টা
জুতা ... জুতি, যোড়ী
বোতাম ... বত্তাই
গহনা ... নাগালু, অস্তুউলু, অলঙ্কারালু
বাতি ... কোবাত্তি
দেশালাই ... আগ্গি পেট্টি
আয়না ... আদ্দমু
মশারী ... দোগতেরা
সাবান ... সাব্বু
চিরুণী ... পাইনা, পান্না
কাগজ ... কাইতুম

বিবিধ।

ফুল ... পুলু, পুষ্পম্
বড় ... পেদ্দা
ছোট ... চেন্না
ভাল ... মান্চী
মন্দ ... চ্যাড্ডা
কথা ... মাটা
স্নান ... স্নানম্
বেতন, মাহিনা জিতম্
গাড়ী ... ব্যাণ্ডী
ভাড়া ... আদ্দি
মুল্য ... করীদ

সময়।

মাস ... ন্যালা, নালা
দিন ... দিনম্, রোজু, পকলু
রাত্রি ... রাত্রি, রাত
সকাল ... প্রত্যুটা, পদ্দুনু
সন্ধ্যা ... সায়ন্ত্রম্, সন্ধেওলা
মধ্যাহ্ন ... মধ্যাহ্নম্
এখন ... এপ্পুড়ু
আজ ... ইবেলা, এম্পাতি
কাল (কল্য) রেপু
পরশ্ব ... এলুণ্ডি
গত কাল (কল্য) নিন্না
গত পরশ্ব ... মান্না

বাটি প্রভৃতি।

বাড়ী ... ইল্লু
ঘর ... গাদি
জানালা ... খিট্কী
এধার ... ইলাগ
ওধার ... আলাগ
পাইখানা ... পাইখানা
কূপ ... নুয়্যী
দোকান ... দোকানম্

বাজার	...	বাজারু
হাট	...	সান্তা
সমুদ্র	...	সমুদ্রম্
সমুদ্র-তীর	...	সমুদ্র-ওড্ডু
		সমুদ্র-মুখরা

ব্যক্তি প্রভৃতি।

আমি	...	নেনু
আমরা	...	মেমু
তুমি	...	নিউ
আপনি	...	মিরু
আমার	...	নাদ্দি
আমাদের	...	মাদ্দি
তোমার	...	নিদ্দি
তোমাদের	...	মিদ্দি
পুরুষ	...	মগ মানুষী
স্ত্রীলোক	...	আড় মানুষী
বাবা	...	বাবু
মা	...	আম্মা
পুত্র	...	কুমারডু, পুত্রডু
		কড়ুকু
কন্যা	...	কুমারতে, কুতরু
বড় ভাই	...	আন্না
বড় ভগ্নী	...	আপ্পা, আক্কা
ছোট ভাই		তাম্মুড্ডু
ছোট ভগ্নী		চেল্লেলু
স্বামী	...	পেরিমিতি
স্ত্রী	...	বারিয়া, পেল্লামু
জামাতা	...	আল্লডু
বধূ	...	কড্ডালু
অলঙ্কৃতা সুসজ্জিতা রমণী	...	মুস্তাবু

বিবিধ বাক্য।

সত্য	...	নিজামু
মিথ্যা	...	আপাদ্যামু
কেনা	...	কনু
কত ?	...	এন্তা ?
মূল্য	...	করীডু
মূল্য কত ?		করীডু এন্তা
কত করিয়া সের?		সের করীডু এন্তা
বড় বেশী দাম		চানা করীডু
দাম কমাও		করিডু তাগিঞ্চু
আমি এত দিব		ইস্তানু
এর বেশী দিতে পারিব না		আন্তা (ইহা) কান্টে (অপেক্ষা) এক্কু (বেশী) ইবমু (দিব না)
ভাড়া কত ?		আদ্দি কি ?

ইহার ভাড়া কত টাকা ?	এনি রূপাই কি আদ্দি ইস্তারু ?
হাঁ ...	উন্টানু
না, নহে, নাহি, নাই ...	লেছ, কাদু
কি ? কেন ?	এমি ? (উচ্চারণ এমি-ই-ই-ই)
বল (কথা বল)	চেপ্পু
এস ...	রা
বস ...	কুর্‌চু
দাঁড়াও, থাক	উণ্ডু
আন (লইয়া এস)	তিশু করা
কেমন আছ ?	এলাগু উন্নারু ?
যাও, চলিয়া যাও	এল্লো
দাও ...	তে
দেখ ...	চুড়ু
যাব ...	এল্লুতম
আমরা থাকিব	উণ্ডি পোতামু, উন্টামু
আমি চাই (I want)	নাকু কাওলা
বাহ্য পাইয়াছে	চেম্বুট কী
এখন নয় ...	এপ্পুড়ু কাদু
তুমি কি করিতেছ ?	এমি চেস্তু নিউ
তোমার খাওয়া হইয়াছে কি ?	ভোজন ওয়েন্দা ?
আমি বেড়াইতে যাইতেছি	পাইকী শিকারকী এল্লু তুনাহু

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত কথাগুলি ব্যবহার করিলে বঙ্গীয় প্রবাসীর এখানে থাকা, দোকানে ও বাজারে ক্রয় করা, ভৃত্যবর্গের সহিত কথা কহা, প্রভৃতি একরূপ চলিয়া যাইবে। কিন্তু রীতিমত এখানকার ভাষায় কথা কহিবার ইচ্ছা হইলে তেলগু শিক্ষক সাহায্যে তেলগু পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিতে হইবে।

উপরোক্ত স্থানীয় কথাগুলির সহিত আমার ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তনের কথাও ফুরাইল। অতঃপর প্রত্যাগমনের পথে কয়েক স্থানের বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গের নিকট বিদায় লইব।

কটক।

(২২)

দেশে যাতায়াত করিতে হইলে পথিমধ্যে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তদুদ্দেশ্যে মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেষণের পার্শ্বে বা নিকটে স্থান পাইলেই সুবিধা হয়। ওয়াল্‌টেয়ার ও কলিকাতার প্রায় ঠিক মধ্যে কটক অবস্থিত। কিন্তু এখানে বিশ্রামের প্রধান অসুবিধা—কটক ষ্টেষণ হইতে কটক সহর তিন মাইল দূরে। এতৎ সত্বেও স্থানীয় আত্মীয়দের অনুরোধে আমাদিগকে কটকে অবতরণ করিতে হইল, এবং তথায় কয়েক দিবস থাকিতেও হইল। সুতরাং এ স্থানে যাহা দেখিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও অনুপযোগী মনে করি না।

কটক অতি প্রাচীন সহর। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বা কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে কলিকাতার পত্তন হয়, তদগ্রে উহা অজ্ঞাতনামা জঙ্গল ও জলাভূমি ছিল। ইহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কটকের নাম ইতিহাসে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগা ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কটকের স্মৃতি ভারতবাসীদের পক্ষে সুখের নহে—দুঃখের, কলঙ্কের, ও লজ্জার। অধিকন্তু কটকের নাম ইতিহাসের স্মৃতিফলকে রক্তের অক্ষরে লিখিত। সংস্কৃত ভাষায় কটক শব্দের দুই অর্থ—শিবির ও দুর্গ; সেই দুই অর্থে অর্থাৎ যুদ্ধ ও কাটাকাটীর উদ্দেশ্যে কটক সহর সৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই কাল হইতেই বরাবর সেইরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক হিন্দু রাজ বংশ পূর্ব্বের হিন্দু রাজ-বংশকে ধ্বংস করিয়া লুণ্ঠন ও শাসনের নামে কটকে

রাজত্ব করিয়াছে ; এইরূপ বহু হিন্দু রাজ-বংশের পর পর ধ্বংসের পর পাঠান মোগল ও মারহাট্টারা কটক ও উড়িষ্যা ভোগ করে, এবং তাহার পর শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে) ইংরাজরা দখল করিয়াছে।

পূর্ব্ব কালের অন্যান্য সহরের ন্যায় কটকের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, এবং ভাল মেরামতী অবস্থায় থাকিলেও ভয়ানক ধূলিপূর্ণ। উন্মুক্ত ও বায়ুপূর্ণ স্থানে যাইতে হইলে দক্ষিণে কাটজুরী নদীর তীর-ভূমি ও অথবা উত্তরে পুরাতন ভগ্ন দুর্গের সম্মুখে খোলা মাঠে যাইতে হয়। প্রধান বাজার—চাঁদনী চক। তথায় রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকান-শ্রেণীতে দেশীয়দের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়।

কটক সহরের প্রায় বার মাইল পশ্চিমে মহানদী দুই মুখে বিভক্ত হইয়াছে ; এক মুখের নাম ঐ মহানদী, অপরের নাম উপরোক্ত কাটজুরী। কাটজুরী কটকের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ও মহানদী কটকের উত্তর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্ব দিকে আরও কিছুদূর গিয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছে। বর্ষা কালে এই দুই নদীর ভয়ঙ্কর জলরাশি হইতে রক্ষার্থ কটকের চারি দিকে উচ্চ বাঁধ আছে। হিন্দুদিগের সময়ে এই বাঁধ প্রস্তুত হইয়া, তাঁহাদের কীর্ত্তিস্বরূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা অতি স্থূলরূপে নির্ম্মিত ও অধিকাংশ স্থানে প্রস্তর দ্বারা গাঁথা। কাটজুরীর ধারে বাঁধ প্রায় ২৬ ফুট বা ১৭ হাত উচ্চ। এই বাঁধ নদীদ্বয়ের উন্মুক্ত গ্রাস হইতে কটককে রক্ষা করিতেছে। যদি কোন ক্রমে ঐ বাঁধ উপচাইয়া কটকে জল প্রবেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ সমুদয় একতল বাটী, রাস্তার ধারের দোকান, প্রভৃতি, জলের নিয়ে পড়িবে। এই জন্য বর্ষা কালে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান থাকিতে হয়।

হিন্দু কালের অপর প্রাচীন চিহ্ন ভগ্ন দুর্গাবশেষ। ইহার একটী মাত্র তোরণকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বজায় রাখা হইয়াছে। এই তোরণ অতি স্থূল

ও প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত এবং ইহার উপরে বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুর্গের চতুর্দ্দিকের সুনির্ম্মিত বিস্তৃত পরিখা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুর্গমধ্যে হিন্দুদের কোন মন্দির নাই। মুশলমান অধিকারে সমুদয় নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তথায় এক মস্‌জিদ ও ইংরাজদের কয়েকটী বাটী রহিয়াছে।

মহারাষ্ট্র রাজত্বের এক চিহ্ন—রামবাগ—এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কটক সহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ও কাটজুরী নদীর উপরে রামবাগ অবস্থিত। ইহা এক উদ্যান-বাটী, ইহার প্রকৃত নাম আরামবাগ, অর্থাৎ আরামের উদ্যান। মহারাষ্ট্র অধিকার কালে তাঁহাদের স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ঐ উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আরাম করিতেন। এক্ষণে উড়িষ্যার কমিষ্যণর তথায় বাস করেন।

কটক উড়িয়াদের সহর হইলেও এখানে বাঙ্গালী ভাবেরই প্রাধান্য। কটকে প্রবেশ করিয়া আমার বোধ হইল, বাঙ্গালা দেশে আসিলাম—কারণ সর্ব্বত্র বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা, বাঙ্গালীদের মত পরিচ্ছদ। চৈতন্য দেব ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় ধর্ম্মপ্রচার করেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে তথায় বাঙ্গালীদের বসতি হয় নাই।) বিগত দুই শতাব্দী হইতে বাঙ্গালীরা উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম প্রথম যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বাঙ্গালা দেশের স্বজাতিবর্গের সহিত বিবাহাদি সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। কায়স্থেরা "কট্‌কী কায়েত" অভিহিত হইয়াছে এবং কতকটা উড়িয়া-ভাবাপন্ন হইয়াছে; তবে এক্ষণে শিক্ষা ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধিতে পুনরায় উহাদের সহিত বাঙ্গালা দেশের স্বজাতীয়দের চলন হইবে, এইরূপ বোধ হয়। যাহারা বিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছে, তাহারা বঙ্গদেশের সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। জমিদার, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী,

ইত্যাদিরূপে মেদিনীপুর হইতে পুরী পর্য্যন্ত অসংখ্য বাঙ্গালী এক্ষণে উড়িষ্যায় স্থায়ীরূপে বাস করিতেছে।

প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে হিন্দুর মধ্যে ধরিলে উহাদের কীর্ত্তি-কলাপই এখানকার প্রধান হিন্দু-চিহ্ন। এ প্রদেশের বর্ত্তমান দেব-মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই জৈন দেব-মূর্ত্তির মত। সম্ভবতঃ হিন্দুরা জৈনদিগকে দূর করিবার পর তাহাদের দেব বিগ্রহগুলি আপন দেব-বিগ্রহে পরিণত করিয়াছেন। মন্দির সকলের গঠনও জৈনদের মন্দিরের মত। জৈনদের অনেক উৎসবও হিন্দুদের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে, যথা পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা জৈনদের রথযাত্রার অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে।

কটকে খাদ্য দ্রব্য কলিকাতা অপেক্ষা অনেক সুলভ। এখানে ১০৫ তোলায় এক সের হয়, অর্থাৎ উহা কলিকাতার ১ সের ৫ ছটাকের সমান। এইরূপ প্রতি সেরের মূল্য—খাঁটি দুগ্ধ ৵০, মৎস্য ।০, মাংস ।/০, ইত্যাদি;—কিরূপ সুলভ দেখুন। ঘৃত উত্তম এবং কলিকাতার মত চর্ব্বি মিশ্রিত নহে, এ কারণে এখানকার ময়রার দ্রব্য খাইলে অম্ল হয় না।

কটকের জল হাওয়া ভাল, তজ্জন্য অনেকে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ আসেন। কিন্তু তাঁহাদের কাটজুরী নদীর তীরে বা কোন খোলা স্থানে থাকা উচিত। ওয়াল্‌টেয়ারের মত এখানকার বায়ু অত উৎকৃষ্ট ও আর্দ্রতা-শূন্য না হইলেও—কারণ এখানে আমি কুয়াসা হইতে দেখিয়াছি—উহা স্বাস্থ্যজনক ও কলিকাতা অপেক্ষা ভাল।

নারাজ, সিদ্ধেশ্বর, ও ধবলেশ্বর।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, কটক হইতে ১২ মাইল দূরে নারাজ নামক স্থানে মহানদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহা এক দেখিবার স্থান। তথায় কাটজুরী নদীর সমগ্র বিস্তার ব্যাপিয়া 'আনিকট' গাঁথা আছে। আনিকট অর্থে নদীর তলদেশ হইতে জলের উপর পর্য্যন্ত গাঁথা বাঁধ, বাঁধের উপর মহা স্থূল স্তম্ভ-শ্রেণী, এবং প্রতি দুই স্তম্ভের মধ্যে লৌহের ফটক ও দ্বার। এই ফটকগুলি জল প্রবেশের জন্য কখন খুলিয়া দেওয়া হয় কি না বলিতে পারি না। আমি দেখিলাম, উহা উপচাইয়া মহানদীর জল কাটজুরীতে প্রবেশ করিতেছে। মহানদীর বিশাল জলরাশির পরিমাণে কাটজুরীর ভিতরে প্রবিশ্যমান জল অল্প বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা নিতান্ত অল্প নহে। এক একটী ফটকের উপর দিয়া পাঁচ সাত হাত পরিমাণ বিস্তার-বিশিষ্ট জলস্রোত ভীষণ বেগে দশ বার হাত নিম্নে পড়িতেছে। এই জলপ্রপাত দৃশ্যসকল অতি সুন্দর। ফটকগুলির

উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্তম্ভ গুলির উপর দুই একখানা করিয়া তক্তা বিছান আছে, তাহার উপর হাঁটিয়া আমি ও সঙ্গীয় কয়েকটী রমণী প্রায় সমস্ত আনিকটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইয়াছিলাম। পদ-নিম্নে ফটক-উল্লম্ফনকারী জলস্রোত, এবং দুই পার্শ্বে দুই নদীর সুবিস্তৃত জলরাশি, একারণে ঐরূপে বেড়ানয় যৎকিঞ্চিৎ সাহস ও সাবধানতার আবশ্যক।

এই আনিকটের নিকটে গভর্ণমেণ্টের এক বাংলা আছে।

হিন্দুদের পক্ষে এখানে আর এক দেখিবার বস্তু—অর্দ্ধ মাইল আন্দাজ দূরে নারাজ পাহাড়ের উপর এক শিব-মন্দির ও গুহা। ইংরাজীতে এই স্থানকে Romantic বা সুন্দর কল্পনা-স্মৃষ্টি বলা যাইতে পারে। পাহাড়ের তলদেশ হইতে উপর পর্য্যন্ত বৃক্ষরাজিতে আচ্ছন্ন। মহা প্রকাণ্ড আমগাছ সকল নিম্ন প্রদেশে সূর্য্যালোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছে—সমস্ত স্থান যেন আমগাছের ছায়াময় এক সুবিশাল কুঞ্জবন। আমি যে সময়ে যাই, তখন ঐ গাছগুলি মুকুলে একেবারে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়াছিল, গাছের পাতা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না। এত মুকুল দেখিলাম যে ভাবিলাম, উহার বার আনা নষ্ট হইয়া গিয়া যদি চার আনাতেও ফল হয়, তবে তাহাও অপরিমেয় হইবে, এবং এই বন-প্রদেশে উহা খাইবার লোক কোথায়? কিন্তু পরক্ষণে সে ভাবনা দূর হইল; দেখিলাম, বৃক্ষগুলি অসংখ্য বানরে পরিপূর্ণ, নিম্নে ভূমিতেও বানর ও বানর-শিশুরা আনন্দভরে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, এবং আমের মুকুল হইতে ফল পর্য্যন্ত প্রধানতঃ উহাদেরই যথেচ্ছ ভক্ষণ ও ধ্বংশের নিমিত্ত রহিয়াছে। উড়ের দেশের মানুষের ন্যায় উড়ে বানরেরাও অতি ভীরু, সামান্য তাড়া করিবামাত্র, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ও দূর হইতে দূরান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

ইহার পর আমাদের দল উপরে উঠিতে লাগিল। নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত যাইবার পথ ভাল নহে এবং উভয় পার্শ্বে অল্প অল্প জঙ্গল। পাহাড়ের শিরোদেশের কিছু নিম্নে মন্দির। মন্দিরটী অসংস্কৃত নহে বটে কিন্তু পূজক বা রক্ষক শূন্য। বিগ্রহের নাম সিদ্ধেশ্বর। এই নির্জ্জন স্থানে মন্দির খোলাই পড়িয়া থাকে, যাত্রী আসিলে মন্দিরাধ্যক্ষ কোথা হইতে আসিয়া পয়সা আদায় করে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকার বাস। মন্দিরের অনতিদূরে নদীর দিকে এক ক্ষুদ্র পাকা গোল ঘর আছে, বিশ্রাম লাভ বায়ু সেবন ও নিম্নস্থ প্রবাহমানা নদীর দৃশ্য দেখিবার পক্ষে উহা পরম উপযোগী। মন্দিরের ভিতরে দেওয়ালের উপর এবং ঐ গোল ঘরের ভিতর কত দর্শক আপনাদের নাম ধাম প্রভৃতি ইংরাজী বাঙ্গালা উড়িয়া ও হিন্দিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই লেখকের ন্যায় যৎসামান্য লোকের ঐরূপে নাম প্রথিত করিবার বা সহজে স্মরণ-চিহ্ন রাখিবার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া, এখানে বা এইরূপ দৃষ্ট অন্যান্য কোনও স্থানে আমি আমার নাম লিখিয়া আসি নাই। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বে কয়েকটী বৃহৎ গুহা রহিয়াছে, উহা পাহাড় হইতে খোদিত। উহাদের ভিতরে স্বচ্ছন্দে রন্ধন ও অবস্থানাদি করিতে পারা যায়। এখান হইতে আরও কিছু উপরে উঠিলে পাহাড়ের শিরোদেশে পৌছান যায়। তথায় অন্যান্য গাছের মধ্যে অনেক কুঁচের গাছ আছে; বলা বাহুল্য, সঙ্গীয় বালক বালিকারা পকেট ভরিয়া কুঁচ সংগ্রহ করিতে ত্রুটী করে নাই।

অর্দ্ধপথে অর্থাৎ কটক হইতে ৬ মাইল দূরে ধবলেশ্বরের মন্দির বিশেষ দর্শনীয়। ইহা মহানদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ে দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই দ্বীপ নারাজ অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর। যদি কোন সৌখীন ধনী ও মুক্তহস্ত ব্যক্তি এই দ্বীপের অধিকারী হইতেন, না জানি তিনি এই দ্বীপটাকে কি এক অপরূপ দৃশ্যেই পরিণত করিতে

পারিতেন। বর্ত্তমানে এই দ্বীপ মনুষ্যের বাস হইলেও জঙ্গলে পূর্ণ। নিম্ন হইতে উপরে উঠিবার দুই পথ আছে, একটী সেকেলে পাহাড়ে পথ, অপরটী সুগঠিত সোপানময় পথ। উপরে মন্দির। উহার শ্বেত চূড়া নিম্নস্থ নদীর বহু দূর হইতে দেখা যায়। মন্দির মন্দ নহে, উহার সহিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, দেবতার ভোগ-গৃহ, যাত্রীদের বিশ্রাম স্থান, প্রভৃতি সংলগ্ন আছে। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিব, নাম ধবলেশ্বর, এবং উহার "ধবলেশ্বর" নামের অনুকরণে মন্দিরটীও চুণকাম দ্বারা সম্পূর্ণ ধবল করিয়া রাখা হইয়াছে। শিব ব্যতীত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আরও অনেকগুলি বিগ্রহ আছে। বলা বাহুল্য, দর্শককে সমুদয় বিগ্রহের নিকটেই কিছু কিছু দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ভিক্ষুকদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে হয়। পাহাড়ের তলদেশে এক পুরাতন ভগ্ন মন্দির আছে, উহার দেবতাও মহাদেব, নাম বুড়ালিঙ্গ। পাহাড়ের উপর ময়রার দোকান আছে। অগ্রে ধবলেশ্বর হইয়া নারাজ যাইতে হয়, একারণে নারাজে আহারের জন্য ধবলেশ্বর হইতে আহার্য্য ক্রয় করিতে হয়। অথবা ধবলেশ্বরেই নিম্নস্থ নদী-জলে স্নান করিয়া উপরে দোকানে আহারাদি সমাপন করা কর্ত্তব্য। আমরা এইরূপই করিয়াছিলাম।

নদীর উভয় পার্শ্বের অনেক স্থানে বালির চড়া ভূমির উপর বিবিধ তরি তরকারীর চাস হইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্য কটকে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। আমরা এক স্থানে নৌকা লাগাইয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এক ক্ষেত্রে তরমুজ ফুটী কাঁকুড় ও বিলাতী কুমড়ার লতা মিশ্রভাবে রোপিত হইয়াছে। উৎপন্ন ফলের পরিমাণ আমাকে চমৎকৃত করিল, এত ফল যে হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে কখন আমার ধারণার মধ্যে আসে নাই; ফলে ফলে সমস্ত মাঠ একেবারে সমাকীর্ণ, মাঠে চলিতে ফল নষ্ট করিবার আশঙ্কায় সাবধান হইয়া পদক্ষেপ করিতে হইল। তাহার পর, কিরূপ

সুলভ মূল্য, তাহাও শুনুন। কলিকাতায় যে তরমুজের মূল্য চার আনা, তথায় সেরূপ চার পয়সায় ক্রয় করিলাম। কলিকাতায় তিন চার পয়সা মূল্যের অর্থাৎ ছোট ছোট তরমুজ তথায় পয়সায় তিনটী পাইলাম। ফুটী ও বিলাতী কুমড়ারও মূল্য কলিকাতার সিকি।

সমুদয় পথ নৌকাযোগে যাইতে হয়। বর্ষা ব্যতীত অন্য সকল সময়ে জল কম হেতু লগী মারিয়া ও গুণ টানিয়া যাইতে হয়, এবং স্থানে স্থানে নৌকা বালিতে আট্‌কাইয়া যায়। এ কারণে এই সামান্য ১২ মাইল পথ যাইতে ১২ ঘণ্টা বা তাহার অধিক সময় লাগে। আমরা এক বৃহৎ বজরা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। বুধবার (২২এ মাঘ, ১৩১৪) রাত্রি ৯ টার পর নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী দিবসদ্বয় ব্যতীত ঐ রাত্রেরও কতক কতক সময় নৌকা চলিয়াছিল। তথাপি উপরোক্ত কয়টী স্থান দেখিয়া আমরা ফিরিয়াছিলাম শুক্রবার বেলা ২টা। ছোট নৌকা হইলে অল্প সময় লাগিত বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের মত সুখে যাওয়া হইত না। আমাদের নৌকায় দুইটী কামরা, পাইখানা, পাকের ঘর ছিল। আমরা নৌকায় রন্ধন আহার ও বিশ্রাম লাভ করিতে করিতে যাইয়াছিলাম।
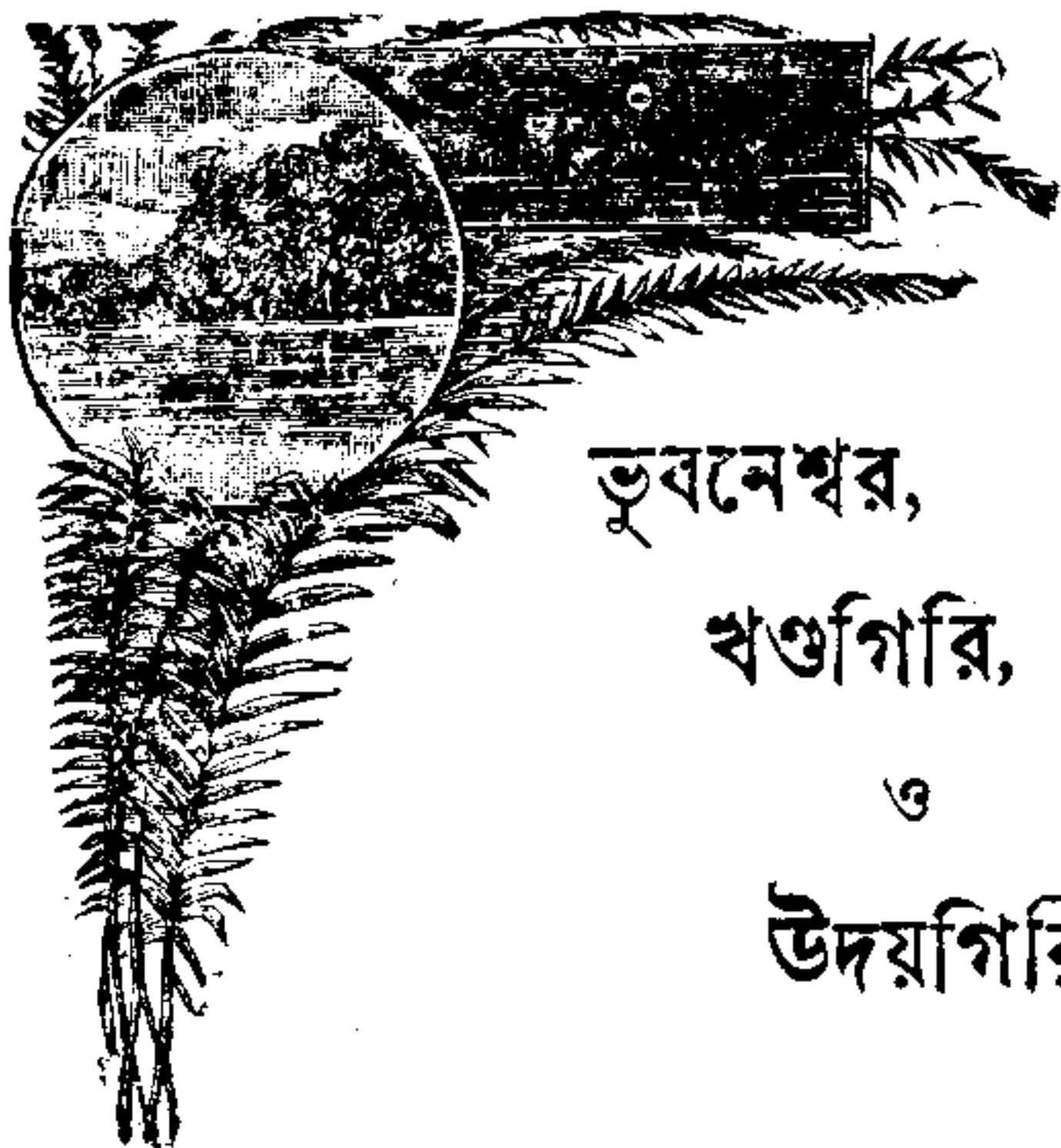
ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, ও উদয়গিরি ।

(২৪)

কটক হইতে রেলযোগে পুনরায় দক্ষিণ মুখে রওনা হইয়া ভুবনেশ্বরে যাইলাম। ভুবনেশ্বর হিন্দুদের অন্যতম মহাতীর্থ এবং এ প্রদেশে উহা পুরীর অব্যবহিত নিম্নে সম্মানিত। কিন্তু পুরীর মন্দিরের পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং উহার কারুকার্য্য বিস্ময়জনক। জনশ্রুতি বলে, এখানে প্রথম কালে লক্ষাধিক মন্দির ছিল। অত না হউক, অত্যধিক সংখ্যক যে ছিল তাহার সন্দেহ নাই, কারণ এখানে ভাঙ্গা মন্দির সমূহের খণ্ড খণ্ড অংশ যেখানে সেখানে দেখা যায়। ভগ্ন ও অভগ্ন মন্দিরে ভুবনেশ্বরকে মন্দিরের সহর বলা যাইতে পারে। এত অধিক মন্দির অন্য কোন হিন্দু তীর্থে বা সহরে নাই।

ষ্টেষণ হইতে বাহির হইতেই অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানে পাণ্ডারা ধরিল। শুনিলাম, এখানে ৩৬০ ঘর পাণ্ডা আছে। বিরক্তিজনক হইলেও তীর্থে পাণ্ডার সাহায্য লওয়া উচিত, নতুবা অপরিচিত নূতন স্থান জন্য নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। ষ্টেষণ হইতে ভুবনেশ্বর সহর কিছু কম আড়াই মাইল দূরে। পথ ভাল। আচ্ছাদিত গোযান দ্বারা যাওয়া আসা করিতে হয়। একেবারেই যাওয়া ও তৎসহিত ফিরিয়া আসার ভাড়া স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ষ্টেষণ হইতে ভুবনেশ্বর যাওয়া আসা ।০—।/০, এবং উদয়গিরি প্রভৃতিতে যাওয়া আসা ৷৷০, মোট ৸০—৸/০ ভাড়া।

সঙ্গে খাদ্য না থাকিলেও কোন চিন্তা নাই। ভুবনেশ্বরে পৌঁছিলেই নিযুক্ত পাণ্ডা ভোগ আনিয়া দিবে, এবং তাহা অখাদ্য নহে। প্রাচীন কালের বৌদ্ধ-প্রাধান্যের চিহ্নস্বরূপ পুরীতে আহারে জাতিভেদবিচার ও স্পর্শ-দোষ নাই, ইহা সকলেই জানেন। এখানেও ঐরূপ—তবে প্রভেদ এই যে, পুরীতে প্রধান দেবতা জগন্নাথ বা বিষ্ণু, কিন্তু এখানে প্রধান দেবতা মহাদেব।

ষ্টেষণ হইতে ভুবনেশ্বরাভিমুখে ১৷৷ মাইল যাইলে মন্দির-শ্রেণী চক্ষে পড়িতে আরম্ভ হয়। এই স্থানের নাম রামেশ্বর। পথের বাম বা পূর্ব্ব দিকে তিনটী ভগ্ন মন্দির অবস্থিত, উহাদের উপরের সমুদয় কার্য্য খসিয়া গিয়াছে, কেবল কঙ্কালরূপে গঠনের বৃহৎ প্রস্তরগুলি সাজান রহিয়াছে, বোধ হয় এক ভূমিকম্প হইলেই ভূমিসাৎ হইবে। বিপরীত দিকে অর্থাৎ পথের পশ্চিম দিকে একটী বড় ও দুইটী ছোট মন্দির আছে, উহাদের অবস্থা ভাল। এই সকল মন্দিরেরই দেবতা শিবলিঙ্গ। শেষোক্ত বড় মন্দিরের পার্শ্বে একটী কূপ আছে, উহা দ্রষ্টব্য; ইহা সুগভীর এবং নিম্ন পর্য্যন্ত কেবল পাহাড় কাটিয়া বা খুদিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

আর কিছু অগ্রসর হইলে ভুবনেশ্বর সহরের মন্দিরগুলির চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। ভুবনেশ্বরে প্রবেশের পূর্ব্বে তাহার সংলগ্ন ও উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত বিন্দু সরোবর প্রথমে চক্ষে পড়ে - ইহার অন্য নাম চন্দন-দিঘী। ইহা অতি বৃহৎ পুষ্করিণী, এবং ইহার মধ্যে ছবির ন্যায় একটী সুন্দর ক্ষুদ্র মন্দির ও তাহার প্রাঙ্গণ আছে। ডিঙ্গী দ্বারা তথায় যাইতে হয়, কিন্তু এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। বিন্দু সরোবরের আকার চতুষ্কোণ, চারি দিকের সর্ব্বত্র পাকা বাঁধা সিঁড়ী, কিন্তু কালক্রমে তিন দিকের সিঁড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেবল দক্ষিণ দিকের মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। সরোবরে কুম্ভীর ও প্রকাণ্ড কচ্ছপ আছে, কিন্তু শুনিলাম তাহারা কোন অনিষ্ট করে না। কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় ভুবনেশ্বরের সর্ব্বপ্রধান শিবলিঙ্গ বিগ্রহের নাম "ভুবনেশ্বর"। উহা স্থায়ী বৃহৎ মুর্ত্তি। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ২২ দিন যাবৎ উহার প্রতিনিধিস্বরূপ এক ক্ষুদ্র বিগ্রহকে বিন্দু সরোবরের উপরোক্ত মন্দিরে প্রত্যহ আনা ও কিছুক্ষণ রাখিয়া পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। বিন্দু সরোবরে শ্রাদ্ধ তর্পণ ও স্নান করিতে হয়।

ভুবনেশ্বর অতি ক্ষুদ্র সহর। তথায় পৌঁছিলে পাণ্ডা প্রথমে বাসা ঠিক করিয়া দিবে। শুনিলাম বাসা-ভাড়া জন প্রতি দিন দুই পয়সা, কিন্তু আমাদের তাহা স্বতন্ত্র দিতে হয় নাই, উহা পাণ্ডার বিদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বাসায় দ্রব্যাদি রাখিয়া আমাদের আপন তালা দ্বারা তাহার দ্বার বন্ধ করিয়া মন্দির দেখিতে বহির্গত হইলাম।

পুরীর মন্দিরের ন্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চারি দিকে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের চারি দিকে স্থূল ও উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন, এবং পূর্ব্ব দিকে উচ্চ ও স্থূল তোরণ-দ্বার, তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটী গঠিত সিংহ। প্রাঙ্গণে

সর্ব্বত্র অনেক ছোট বড় মন্দির আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের ভগ্নাবস্থা, কেবল কয়েকটী মেরামত হইবে, এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। ভাল অবস্থার মন্দিরগুলির ভিতর কালী অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী প্রভৃতি বিগ্রহ আছে। ভুবনেশ্বরের আসল বা প্রধান মন্দিরের উচ্চতা বাঙ্গালী ধরণের বাটীর ৬ তলা হইবে, এবং ইহা সম্পূর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দিরের তলদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত গাত্রে প্রস্তরে খোদা নানা বিচিত্র কারুকার্য্য আছে, এবং তাহা এত সুন্দর যে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-কীর্ত্তি স্বরূপ অদ্যাপিও কি এদেশী কি বিদেশী দর্শক মাত্রকে বিস্ময়ান্বিত করিতেছে। এই কারুকার্য্যের তুলনায় বিখ্যাত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরও কিছুই নহে। জগন্নাথ মন্দিরের বহির্গাত্রে কেবল মূর্ত্তি গঠিত আছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি অকথ্য অশ্লীলতা পূর্ণ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য অন্য কোন সুন্দর কার্য্য নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ "ভুবনেশ্বর" শিবলিঙ্গ ব্যতীত জগন্নাথ ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক দেবতারও মন্দির ভুবনেশ্বরে আছে। বলা বাহুল্য, পাণ্ডারা সেগুলিও দেখাইতে ত্রুটী করে না।

প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ ঋষিগণের তপস্যার স্থান প্রসিদ্ধ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি এখান হইতে পশ্চিম দিকে পৌনে চার মাইল দূরে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গরুর গাড়ী দ্বারা তথায় যাওয়া ও আসার ভাড়া ॥০। আমি বাইসিকল দ্বারা গিয়াছিলাম। পথ পাকা ও ভাল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অসংস্কৃত, এবং এক স্থান একেবারে ভগ্ন, মাঠের জল তাহার উপর প্রবাহিত। এই স্থানে আমার বাইসিকল পার করিতে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সাধারণ যাত্রীকে গরুর গাড়ী গিরিদ্বয়ের তলদেশে নামাইয়া দেয় এবং তাহার পর নিজ পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়,

ইত্যাদিরূপে মেদিনীপুর হইতে পুরী পর্য্যন্ত অসংখ্য বাঙ্গালী এক্ষণে উড়িষ্যায় স্থায়ীরূপে বাস করিতেছে।

প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে হিন্দুর মধ্যে ধরিলে উহাদের কীর্ত্তি-কলাপই এখানকার প্রধান হিন্দু-চিহ্ন। এ প্রদেশের বর্ত্তমান দেব-মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই জৈন দেব-মূর্ত্তির মত। সম্ভবতঃ হিন্দুরা জৈনদিগকে দূর করিবার পর তাহাদের দেব বিগ্রহগুলি আপন দেব-বিগ্রহে পরিণত করিয়াছেন। মন্দির সকলের গঠনও জৈনদের মন্দিরের মত। জৈনদের অনেক উৎসবও হিন্দুদের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে, যথা পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা জৈনদের রথযাত্রার অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে।

কটকে খাদ্য দ্রব্য কলিকাতা অপেক্ষা অনেক সুলভ। এখানে ১০৫ তোলায় এক সের হয়, অর্থাৎ উহা কলিকাতার ১ সের ৫ ছটাকের সমান। এইরূপ প্রতি সেরের মূল্য—খাঁটি দুগ্ধ ৵০, মৎস্য ।০, মাংস ।৵০, ইত্যাদি ;—কিরূপ সুলভ দেখুন। ঘৃত উত্তম এবং কলিকাতার মত চর্ব্বি মিশ্রিত নহে, এ কারণে এখানকার ময়রার দ্রব্য খাইলে অম্ল হয় না।

কটকের জল হাওয়া ভাল, তজ্জন্য অনেকে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ আসেন। কিন্তু তাঁহাদের কাটজুরী নদীর তীরে বা কোন খোলা স্থানে থাকা উচিত। ওয়াল্‌টেয়ারের মত এখানকার বায়ু অত উৎকৃষ্ট ও আর্দ্রতা-শূন্য না হইলেও—কারণ এখানে আমি কুয়াসা হইতে দেখিয়াছি—উহা স্বাস্থ্যজনক ও কলিকাতা অপেক্ষা ভাল।

ঘর আছে। কোন রাণী তপস্বিনী হইলে এই রাণী গুহা তাঁহারই উপযুক্ত বাসস্থান। ইতিহাসে এইরূপ অনেক বৌদ্ধ রাণী ও চিরকুমারী রাজকন্যার কথা আছে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের কাহারও অবস্থানের জন্য এই গুহা নির্ম্মিত ও ঐরূপ অভিহিত হইয়াছিল। উভয় গিরিতে ছোট বড় সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫২টী গুহা আছে, তন্মধ্যে উদয়গিরিতেই অধিকাংশ অবস্থিত।

কত অর্থব্যয়ে কত দিনের কত লোকের কত অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে আদত পাহাড় খুদিয়া কাটিয়া কারুকার্য্য সহিত এই গুহাগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে পারা যায় না। তাহার পর, পাঠক এইখানে আসিয়া বসিয়া, বর্ত্তমান জগৎ বিস্মৃত হইয়া, কল্পনা দ্বারা ক্ষণকালের জন্য মনশ্চক্ষুতে দেখুন, দুই সহস্র বৎসর সেই প্রাচীন ঋষিরা এই গুহাগুলিতে অবস্থান করিতেছেন, কেহ পাঠে কেহ রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত, কেহ বা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এই দৃশ্যের কল্পনায় কি অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে না নিমগ্ন হইবেন! তাঁহাদের সময় হইতে মনুষ্য জাতির কত শত পুরুষ আমাদের মত জন্মিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু এখনও এই স্মৃতিচিহ্ন-গুলি বর্ত্তমান থাকিয়া সেই প্রাচীন মহাপুরুষদের এককালীন অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পার্শ্বপার্শ্বী অবস্থিত। খণ্ডগিরির উচ্চতা ১৫০ ফুট, উদয়গিরির ১০০ ফুট। উদয়গিরিতে কেবল গুহা, এবং ভাল ভাল গুহা আছে। খণ্ডগিরিতে তত গুহা নাই, কিন্তু উহার শিরোদেশে এক মন্দির রহিয়াছে, দেবতা জৈনদের পরেশনাথ। হিন্দুরা এ প্রদেশের সমস্ত মন্দির জৈন ও বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন, মন্দিদের ভিতরে আপন দেবতা বসাইয়াছেন, অনেক স্থলে

পূর্ব্বস্থিত জৈন ও বৌদ্ধ বিগ্রহগুলিকে নিজেদের কোন দেবতার নামে অভিহিত করিয়াছেন; সুতরাং কি কারণে এই এক মাত্র মন্দির ছাড়িয়া দিয়া ঔদার্য্য দেখাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই মন্দিরের নিকট আরও অনেক পতিত ও ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন আছে।

পরিশেষে বলি, যাঁহারা ভারতের তীর্থস্থান, সুন্দর স্থান, ও প্রাচীন স্থান সকল দর্শনের অনুরাগী, তাঁহারা নিশ্চয় যেন ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখেন, নতুবা তাঁহাদের সুখ আনন্দ ও অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সাক্ষীগোপাল পুরী হইতে ১১ মাইল দূরে। পুরী হইতে রেলযোগে সাক্ষীগোপালে গিয়া দর্শনাদি করিয়া সেই দিনই তথা হইতে স্বচ্ছন্দে পুরীতে ফিরিয়া আসিতে পারা যায়। ভুবনেশ্বরের তুলনায় সাক্ষী-গোপাল যদিও কিছুই নহে, তথাপি সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালী রমণীদের বিশ্বাসে ইহা এক মহা প্রয়োজনীয় তীর্থ স্থান। পুরীর জগন্নাথ প্রভৃতি দর্শনের পর তাহার পুণ্য-ফল পাকা করিয়া লইবার জন্য সাক্ষীগোপাল দেব দর্শন একান্ত আবশ্যক। পুরী যাওয়া আসার পথে বৈতরণী নদীতে স্নান দানাদি করিলে পরলোকে বৈতরণী নদী পার হইতে আর কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু কেবল নদী পার হইলেই ত চলিবে না, পার হইয়া সে প্রদেশে ভালরূপে থাকার বন্দোবস্ত ত চাই। তদুদ্দেশে পুরীতে জগন্নাথ দর্শনাদি করিয়া পুণ্য অর্থাৎ পরলোকের সম্বল সঞ্চয় করা হয়। আর হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস—"রথে চ বামনম্ দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে", অর্থাৎ রথ-যাত্রায় রথের উপর জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিলে আর কখন মনুষ্যরূপে জন্মিয়া পৃথিবীতে ফিরিতে হইবে না, চিরকাল স্বর্গে বাস হইবে। সুতরাং সেই অনন্ত চিরকালের

উদ্দেশ্যে মনুষ্য-জীবনে যে সম্বল বা পুণ্য সঞ্চয় করা হইল, তাহার ফল পাকা করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সাক্ষীগোপাল দর্শন করিলেই তাহা হয়, অর্থাৎ তিনি পরলোকে যমরাজ বা ধর্ম্মরাজের নিকট বিচার-কালে সাক্ষ্য দেন যে, এই যাত্রী মিথ্যা বলিতেছে না, যথার্থ এব্যক্তি পুরীর জগন্নাথ প্রভৃতি দর্শন করিয়াছে। সাক্ষীগোপালকে পূজাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সাক্ষী করিয়া না রাখিলে, যদি যমরাজ পুরী-যাত্রীর কথা বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ, সকল পরিশ্রম অর্থব্যয় দেবদর্শনাদি একেবারে মাটী হইল! একারণে পুরী হইতে প্রত্যাগমনের পথে সাক্ষীগোপালে যাইতেই হইবে, এমন স্থান কি বিশ্বাসী হিন্দু রমণীরা ত্যাগ করিতে পারেন।

সাক্ষীগোপাল ষ্টেষণ হইতে সাক্ষীগোপাল মন্দির প্রায় এক মাইল দূরে। তথায় যাইবার জন্য আচ্ছাদিত গরুর গাড়ী পাওয়া যায়, তবে সামান্যও পদশক্তিবিশিষ্ট লোকের তাহার প্রয়োজন নাই। সাক্ষীগোপাল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রাস্তা ভাল। বাজার পুলিস ষ্টেষণ প্রভৃতি আছে। যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেক ঘর আছে, পর্ব্ব ব্যতীত অন্য সময়ে অল্প ভাড়ায় তাহা পাওয়া যায়। পর্ব্বে ভাড়া অত্যন্ত বাড়ে। তথায় রন্ধন ভোজনাদির সুবিধা আছে, চাল ডাল প্রভৃতি সাধারণ দ্রব্যসকল নিকটস্থ দোকানগুলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল এক দিনের জন্য যাঁহারা যান, তাঁহাদের রন্ধনাদি না করিয়া জলযোগ করিয়া কাটাইলেও চলে। আর মন্দির হইতে ভোগও পাওয়া যায়, নিযুক্ত পাণ্ডাকে বলিলে আনিয়া দেয়, তবে তাহা ভক্ত ও নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্যতীত অন্যের ভাল লাগিবে না। পাণ্ডা অপরিত্যাজ্য, উহাদের উৎপাত ও প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানেও পূর্ণ মাত্রায় আছে, বাস্তবিক উহাদের সাহায্য না লইলে চলেও না।

উড়িষ্যার অন্যান্য স্থানের মন্দিরের ন্যায় এখানকার সাক্ষীগোপালের মন্দিরের চারি দিকে প্রাচীরের বেষ্টন, এই বেষ্টনের মধ্য প্রদেশে মন্দির, মন্দিরের চারি দিকে প্রাঙ্গণ বা খোলা জায়গা, এবং তাহার পরে (বহিঃ-প্রাচীরের ভিতর দিকে) যাত্রীদের বিশ্রাম গৃহ প্রভৃতি আছে। মন্দিরের গঠন পুরীর মন্দির প্রভৃতির ন্যায় এবং তদনুরূপ ইহা চূড়ার গাত্রে কয়েকটী অশ্লীল মূর্ত্তিও আছে। অশ্লীল মূর্ত্তি না থাকিলে এপ্রদেশে মন্দিরই অসম্পূর্ণ হয়। ভিতরে প্রধান দেব সাক্ষীগোপালের বিগ্রহ অতীব দর্শনযোগ্য। এই মূর্ত্তি পূর্ব্বে প্রাচীন বিজয় নগরে ছিল, উড়িষ্যার অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা পুরুষোত্তম দেও ইং ১৪৯৫ সালে তথা হইতে ইহা বলপূর্ব্বক আনাইয়া এখানে স্থাপন করেন। এই বিগ্রহ কৃষ্ণের মূর্ত্তি, কৃষ্ণপ্রস্তরে অতি স্বাভাবিক সুন্দররূপে খোদিত এবং দেবতারূপে বিশ্বাস না করিলেও গঠনের প্রণালীতে দর্শনযোগ্য ও আনন্দদায়ক। মূর্ত্তির আকার ১২।১৪ বৎসরের বালকের মত। ইহার পার্শ্বে পরে এতদনুরূপ এক পিত্তল-নির্ম্মিত লক্ষ্মী মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার গঠন উত্তম হইলেও অত সুন্দর বা স্বাভাবিক নহে।

বাঙ্গালী দর্শকদের মধ্যে যাঁহারা লিখিতে পারেন, তাঁহারা সাক্ষী-গোপালকে কেবল পরলোকের সাক্ষী করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, মন্দিরের ভিতরে ও বহির্গাত্রে নিজ নাম ও ঠিকানা ইংরাজি ও বাঙ্গালায় লিখিয়া রাখিয়া ইহলোকেও তাঁহাদের কৃত তীর্থ-দর্শনের প্রমাণ রাখিয়াছেন। আমার এক ভ্রাতা ইংলণ্ডে বিদ্যাভ্যাস ও বহু বৎসর বাসের পর কলিকাতায় সাহেবী ভাবে ছিলেন। মন্দিরের এক স্থানে ঠিক তাঁহার নামের মত এক নাম লিখিত দেখিয়া আমার সমভিব্যাহারিণী ঐ ভ্রাতার হিন্দু কন্যাকে আমি বলিলাম, তোমার বাপকে অন্যায় সাহেব বল, তিনি কত হিন্দু দেখ, এখানে আসিয়া নাম লিখিয়া রাখিয়া

গিয়াছেন। [হায়, ইহার পর এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই ঐ দুই পরমাত্মীয় আমাকে ত্যাগ করিয়া পরলোকবাসী হইয়াছেন।] সাক্ষী-গোপাল সম্বন্ধে বলিবার আর কিছুই নাই।

এ যাত্রায় পথে পুরীতেও গিয়াছিলাম, কিন্তু পুরী এক্ষণে রেলযোগে প্রত্যহ গম্য ও সকলের জানা স্থান হইয়াছে, একারণে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিলাম না।
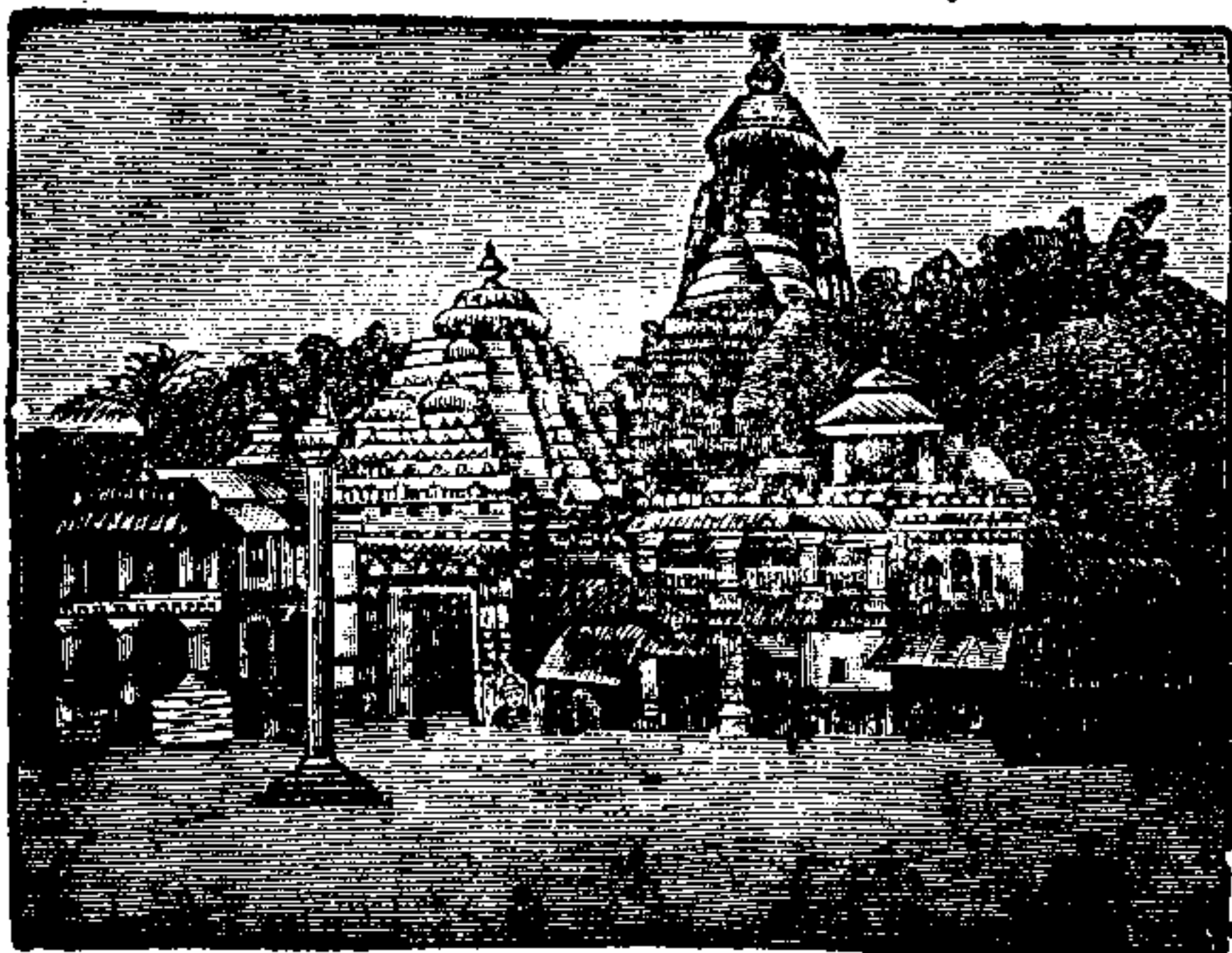
পুরী—জগন্নাথ দেবের মন্দির।

ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজাগাপত্তন

সম্বন্ধে

পরিশিষ্ট।

সন ১৩১৪, ১৩১৫, ও ১৩১৬ সাল, এই তিন বৎসর আমি ওয়াল্‌-টেয়ার-ভিজাগাপত্তন যাইয়াছি এবং প্রতিবার দুই মাস ও তাহার অধিক কাল তথায় থাকিয়াছি। উপরোক্ত প্রথম দুই বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ এই পুস্তক মুদ্রাযন্ত্রে দিই, এবং ছাপা হইয়া যাইবার পর আমি শেষ অর্থাৎ ১৩১৬ সালে যাই। সুতরাং এই বৎসরের দর্শনে যাহা কিছু নূতন দেখিয়াছি বা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা এই পরিশিষ্ট লিখিতেছি।

প্রথম দেখিলাম বাটী ভাড়ার বৃদ্ধি। বাঙ্গালী ও বাহিরের লোকের আগমনে বাটী ভাড়া ক্রমেই বাড়িতেছে। ১৩১৩ সালে যে বাটীর ভাড়া ছিল মাসিক ৫৲, ১৩১৬ সালে তাহা ১২৲ হইয়াছে। আমি শেষ দুই বৎসর যে বাটীতে ছিলাম, শুনিলাম ৫ বৎসর পূর্ব্বে তাহার ভাড়া ছিল ৬৲ মাত্র, উহা ক্রমে বাড়িয়া ১৫৲ হয়, এই ভাড়া আমি ১৩১৫ সালে দিয়াছি, কিন্তু ১৩১৬ সালে আমাকে ২০৲ হিসাবে দিতে হইয়াছে। জমির মূল্যও ঐরূপ হারে বাড়িতেছে। তথাপি আমি ইহা বলিতে বাধ্য, বাঙ্গালীর গম্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী অপর স্থান অর্থাৎ পুরীর তুলনায় এখানে ভাড়া এখনও অনেক কম।

কিন্তু এক দিকে যেমন ভাড়া বাড়িতেছে, অপর দিকে সহরের ক্রমেই উন্নতি দেখিতেছি। অনেক নূতন রাস্তা বাহির করা হইতেছে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটী সমুদ্রতীরস্থ রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী জেলে প্রভৃতি

"নোংরা" লোকদের বাটী কিনিয়া লইয়া তথায় ভাল ভাল বাটী প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করিতেছেন। সহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতারও বৃদ্ধি হইতেছে।

মূল্য-বৃদ্ধি কেবল বাটী-ভাড়াতেই নিবদ্ধ নহে ভৃত্যের বেতন, বাজারের তরি-তরকারী, ইত্যাদিতেও ব্যাপ্ত হইয়াছে। চাকর-চাকরাণীর বেতন মাসে ৩৲ ৪৲র স্থলে ৫৲, ৫।৷০, ৬৲ হইয়াছে। (তবে স্বতন্ত্র আহার দিতে হয় না।) পাতি লেবু প্রথম দুই বৎসর পয়সায় ১০টা কিনিয়াছি, কিন্তু শেষ বৎসর ৪টার অধিক পাই নাই, সময়ে সময়ে ১টা করিয়াও লইতে হইয়াছে। গরু আনিয়া সম্মুখে দোহা দুগ্ধ এক্ষণে টাকায় ৬ সেরের অধিক পাওয়া যায় না, শুনিলাম সময়ে সময়ে মূল্য আরও বাড়ে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এইরূপ বাড়িলেও এখনও কলিকাতা ও পুরীর সীমা হইতে অনেক দূরে আছে।

৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, চেষ্টা করিলে বাঙ্গালা রুচির হিন্দু পাচকও পাওয়া যায়, বেতন ৫৲ ৬৲ মাত্র, খাওয়া দিতে হয় না।" কিন্তু শেষ বারে গিয়া ভুগিয়া শিখিয়াছি, ইহাতে খরচ কম পড়িলেও ভয়ানক অসুবিধা, কারণ পাচক মহাশয় বা পাচিকা মহাশয়ার প্রাতে আবির্ভাব হইবে ৯টার পূর্ব্বে নহে, এবং অপরাহ্ণে তিনি আসিবেন সন্ধ্যার পরে, সুতরাং উভয় বেলায় আহারের সময়ে প্রত্যহ প্রায় ঘড়ীর পূর্ণ সংখ্যা বাজিবে। উড়ে ব্রাহ্মণ পাচক পাওয়া যায়, তাহাদের ও দোষ নাই বটে, কিন্তু এক দিকে যেমন তাহাদের বেতন অধিক (মাসিক ৮৲ ১০৲ ১২৲ টাকা ও স্বতন্ত্র খাওয়া দিতে হয়), অপর দিকে তাহাদের রন্ধন অতি জঘন্য। এই কারণে আমি সঙ্গে করিয়া পাচক লইয়া যাওয়াই উচিত বলি।

এখানে কিন্তু রন্ধনের আর এক মহৎ অসুবিধা এক্ষণে দূর হইয়াছে। ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি যে, এখানে কোক কয়লা পাওয়া যায় না; কিন্তু

শেষ বারে গিয়া দেখিলাম, উহার দোকান হইয়াছে, সুতরাং কাষ্ঠের জ্বালের দ্বারা রন্ধনের অসুবিধায় পড়িতে হইবে না।

তামাক প্রভৃতি বাঙ্গালীর প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যের এক্ষণে আমদানি হইতেছে, সুতরাং ৮ পৃষ্ঠায় লিখিত অসুবিধার আশঙ্কা এক্ষণে নাই।

৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, রেলে পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে পাইখানার বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু এক্ষণে নূতন গঠিত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে ঐ অভাব দূর হইয়াছে। এখন এক প্রকার অতি বৃহৎ গাড়ী হইয়াছে, উহার ৮ খানা চাকা এবং উহা দৈর্ঘ্যে চলিত ৩।৪ খানা গাড়ীর সমান। এই গাড়ীগুলিকে "বগি ক্যারেজ" বলে। তৃতীয় শ্রেণীর এই বগি ক্যারেজগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে; উহা চলিত মধ্য শ্রেণীর গাড়ী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, অধিকন্তু উহা অতি দীর্ঘ হেতু উহাতে পাইচারী করিতে পারা যায়, চলিত গাড়ীর কামরার মত উহাতে কয়েদী হইয়া থাকিতে হয় না। এই গাড়ীতে অল্প ব্যয়ে বেশ যাতায়াত করিতে পারা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহাতে দুর্গন্ধ-কাপড়-পরিহিত অপরিষ্কার নিম্নশ্রেণীর লোকের সহবাসে সময়ে সময়ে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হয়।

১২ পৃষ্ঠায় লিখিত প্লেগ পাসের ১০ দিন কমাইয়া এক্ষণে ৭ দিন করা হইয়াছে। ইহা এক কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব বটে।

লেখনীর বিশ্রাম।